নষ্ট জীবন

১

মেয়েটি পুলকের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললো,

‘একজন মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে বসেছেন, আর আপনারা কোনো সহযোগিতা করছেন না! আপনাদের মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই?’

পুলক মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটির গায়ে মেরুন রঙের মলিন তাঁতের শাড়ি। মাথার চুল খোলা। এলোমেলো। মলিন মুখ। চোখের নিচে কালচে রঙ। গায়ের রঙটা ফর্সা হলেও রোদে পুড়ে তা তামাটে হয়ে গেছে। মেয়েটির মুখায়বে কোথাও একটা সৌন্দর্যের ঝিলিক যেন আছে। ওর অবয়ব জুড়ে এক তাল বিষণ্নতা ফুটে রয়েছে। বিপদে পড়লে এ ধরনের মেয়েরা চট করেই চোখে মুখে গভীর বিষণ্নতা ফুটিয়ে তুলতে পারে। পুলক দ্রুত মেয়েটির মুখ থেকে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। পুলকের সঙ্গে এই মেয়েটির দেখা হয়েছে আরো দু’বার। তখন ও মেয়েটিকে ভালো করে দেখেনি। দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। এবার একটু তাকিয়ে দেখে নিল। মেয়েটির অনুরোধে সাড়া দেয়া ঠিক হবে না বলে মনে মনে ঠিক করে নিল পুলক। মেয়েটি খুবই অকৃতজ্ঞ শ্রেণীর একজন মানুষ। তাই মেয়েটিকে ও উপেক্ষা করে যাচ্ছিলো। এ ধরনের মেয়েদের উপকার করা ঠিক নয়। এক ধরনের মানুষ আছে, যারা বিপদে পড়লে বিনয় বিগলিত হয়ে যায়। আবার বিপদ কেটে গেলে বেমালুম চোখ উল্টে ফেলে। পুলক অকৃতজ্ঞ শ্রেণীর কাউকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এই মেয়েটিকে উপকার না করে বরং ওকে এখন কষে একটা থাপ্পর মারতে পারলে ওর ভালো লাগতো-ভাবলো ও। কিন্তু ও মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলে না। মেয়েদের সব সময় সম্মান দিয়ে ও কথা বলে।

মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালের জুরুরি বিভাগে দাঁড়িয়ে আছে পুলক। ও বাহারকে দেখতে এসেছিল হাসপাতালে। বাহার ওর নতুন শিষ্য। ও মাস্তানীর লাইনে নতুন। দুলুর লোকজন আজ বাহারকে একা পেয়ে বেধড়ক পিটিয়েছে। গুরুতর আহতাবস্থায় ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ খবর পেয়ে বাহারকে দেখতে ও হাসপাতালে ছুটে এসেছে। এ লাইনে নতুনাবস্থায় বেকায়দায় পড়ে অনেকের মার খেতে হয়। বাহারও খেয়েছে। পুলক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে আসতেই মেয়েটির মুখোমুখি পড়লো। মেয়েটিকে ও প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এড়িয়ে যেতে পারলো না। মেয়েটি ওর পথ আটকে দাঁড়ায়। মেয়েটি এবার অনুনয় ভরা কণ্ঠে পুলকের উদ্দেশ্যে বললো,

‘আমার বাবার স্ট্রোক হয়েছে। ইমার্জেন্সীতে তিনি পড়ে আছেন। কোনো ডাক্তার আসছেন না। আমাকে হেল্প করুন,প্লিজ!’

এ ধরনের অনুরোধ উপক্ষো করে না পুলক। বরং স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়। কিন্তু এই মেয়েটির প্রতি ওর তীব্র রাগ জমে আছে। মাত্র তিন মাস আগে ও মেয়েটিকে ভয়াবহ এক বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। সেদিন রাতে ও এগিয়ে না এলে মেয়েটি অপহৃত হতো পারতো। এমন কী, ধষর্ণের শিকার হতেও পারতো। তিন মাতাল ধরেছিল ওকে। সম্ভবত রাত করে বাড়ি ফিরছিল মেয়েটি। গলির মুখে তিন মাতাল মেয়েটির রিকসা থামিয়েছিল। এরপর চাকু বের করে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল ওরা। ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলো পুলক। মেয়েটির চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়েছিল ও এবং বখাটে মাতালদের হাত থেকে রক্ষাও করতে পেরেছিল ওকে। সেদিন রাতে ও মেয়েটিকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছিল। এর একমাস পরই মেয়েটির কাছ থেকে ও উল্টো প্রতিদান পেলো। টহল পুলিশের ধাওয়া খেয়ে সেদিন অনেকটা কাকতালীয়ভাবে পুলক আশ্রয় নিয়েছিল মেয়েটির বাড়িতে। খোলা দরোজা দিয়ে ও দৌড়ে ঢুকে পড়েছিল ওদের বাড়ির ভেতরে। মেয়েটির কাছে মাত্র তিরিশ মিনিটের আশ্রয় চেয়ে লুকিয়ে পড়েছিল ও। পুলিশ ওদের বাসায় এসে নক্ করতেই দরোজা খুলে দিল মেয়েটি। শুধু তাই নয়, পুলিশ ওর কাছে 'পুলক এখানে এসেছে কিনা' জানতে চাইতেই ও পুলককে দেখিয়ে দিয়েছিল। পুলক সেদিন অবাক চোখে দেখেছিল মেয়েটির অকৃতজ্ঞতা! পুলিশের কাছে একটা মিথ্যা কথা বললে কী এমন ক্ষতি হতো? আজ আবার এই মেয়েটিই পুলকের কাছে সহযোগিতা চাইছে। আশ্চার্য! পুলক মেয়েটিকে কিছু বলার আগেই ঠান্ডু ওর পেছন থেকে বললো,

'অই মাইয়া, তোমার সাহস তো কম না! বসের পথ আটকাইয়া আছো? একদম ফুটা কইরা দিমু!'

ঠান্ডুর কথায় মেয়েটি একটুও ঘাবড়ালো না। ও পুলকের দিকে তাকিয়ে ফের বললো,

'একজন মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আর আপনারা একজন অসহায় মেয়ে মানুষকে ফুটা কইরা দেবার হুমকি দিচ্ছেন! আপনাদের বিবেক বলতে কিছু নেই?'

মেয়েটি বিবেকের কথা বলছে দেখে পুলক বিস্মিত হলো। এ যেন ভুতের মুখে রাম-নাম। পুলিশের হাতে পুলককে তুলে দেবার সময় তার বিবেকটা কোথায় ছিল? এই প্রশ্নে একটু হাসলো পুলক। মেয়েটি বললো,

'আপনি হাসছেন! একজন লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আর আপনি তা শুনে হাসছেন!'

পুলক এবার কথা না বলে পারলো না। ও বললো,

'আপনাকে উপকার কেনো করবো? আপনি তো উপকারীর অপকার করেন!'

'আজকের উপকারটা না হয়, করুনা করেই করেন। কথা দিচ্ছি, যদি কখনো সুযোগ পাই, তবে এর প্রতিদান আপনাকে দেব, প্লিজ!'

মেয়েটির এ কথা শুনে পুলকের ভীষণ হাসি পেল। ও হাসি সামলে নিলো। এই মেয়েটি ওর কী উপকার করবে, তা ভেবে পেল না ও। তবু মেয়েটির কথায় ও কয়েক সেকেন্ড ভাবলো।

কেনো জানি, মেয়েটির জন্য ওর মায়া হতে লাগলো। মেয়েটি অসহায় গলায় আবারো বললো,

‘বিশ্বাস করুন, আমার আপনজন বলতে কেউ নেই এই শহরে। আমাকে একটু হেল্প করুন!’

পুলক এবার গলে গেল। বাইরে থেকে ওকে যতটা কঠিন মনে হয়, আসলে ভেতরে ও ভীষণ নরোম। কারো ঘোর বিপদ দেখলে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পুলক মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললো,

‘ঠিক আছে, চলুন। দেখি কী করতে পারি।’

মেয়েটির দু’চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এলো। পুলক দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেয়েটির মুখ থেকে।

ইমার্জেন্সী বিভাগের যে রুমটিতে ডাক্তার বসেন, পুলক সেখানে এলো। ওর পেছনে ঠান্ডু ও রহমতও এলো। ওদের পেছনে মেয়েটি। ঠান্ডু ও রহমত দু’জনই পুলকের শিষ্য। ঠান্ডু কথা বলে বেশি আর ভীতু। রহমত ঠিক এর উল্টো। রেসিডেন্স মেডিকেল অফিসার অর্থাৎ আরএমও তার রুমে চেয়ারে বসে মনযোগ দিয়ে একটি সিনে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। পুলক আরএমও’র উদ্দেশ্যে বললো,

‘ডাক্তার সাহেব, একজন মুমূর্ষ রোগী ইমার্জেন্সীতে অবচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন, আর আপনি বসে বসে সিনে ম্যাগাজিন পড়ছেন!’

পুলকের কথায় ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ তুললেন আরএমও। তিনি বিরক্ত চোখে তাকালেন পুলকের দিকে। এরপর আরএমও অলস একটি হাই তুলে বললেন,

‘রোগীর কী হয়েছে?’

‘স্ট্রোক!’

পেছন থেকে তড়িঘড়ি জবাব দিল মেয়েটি। আরএমও অলস ভঙ্গিতে বললেন,

‘প্যাশেন্টকে রেফার করে দিচ্ছি। সোরওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে যান।’

কথাটি বলে আরএমও ফের সিনে ম্যাগাজিনে চোখ রাখলেন। যেন রোগী নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। পুলক অবাক ও ক্ষুব্ধ হলো আরএমও’র এই আচরণ দেখে। এই আরএমও যে নতুন এসেছে, তা ও বুঝতে পারছে। নইলে পুলককে চিনতে পারতো এবং সমীহ করে কথা বলতো। পুলক এবার ঠান্ডা গলায় বললো,

‘ডাক্তার সাহেব, এতো রাতে মুমুর্ষ রোগীকে ঢাকায় কীভাবে নেবো? যদি নিজের ভালো চান, ম্যাগাজিনটা রেখে রোগীর চিকিৎসা করুন!’

এ কথায় আরএমও রাগী চোখে তাকালেন পুলকের দিকে। তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাগী গলায় বললেন,

‘আপনার কথায় আমি কাজ করবো নাকি? আপনি কে? কোথাকার লাটবাহাদুর?’

পুলকের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ও জোরে একটা চড় মারলো আরএমও’র গালে। ‘ঠাস’ একটা শব্দ হলো। এক চড়েই অরএমও পড়ে গেলেন মেঝেতে। রহমত এগিয়ে এসে তার কোমড় বরাবর একটা লাথি মারলো। ‘কোৎ’ করে শব্দ বেরিয়ে এলো আরএমও’র মুখ

থেকে। পুলক এবার আরএমও'কে তার শার্টের কলার চেপে টেনে তুললো ফ্লোর থেকে। আরএমও'র শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। পুলক কিছু বলে উঠার আগেই আরএমও মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বললেন,
'স্যার, স্যার! আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। আমি এখুনিই রোগীর চিকিৎসা করছি। আমাকে আর মারবেন না,প্লিজ!'
পুলক তার শার্ট ছেড়ে দিল। বললো,
'এখুনি রোগীর চিকিৎসা কর। নইলে তোর মতো ডাক্তারকে আজ ধলেশ্বরীতে ভাসিয়ে দেব!'
খুব রেগে গেলে পুলক প্রতিপক্ষকে 'তুই' করে কথা বলে। আরএমও পুলকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে গেলেন রোগীর চিকিৎসা করতে। সব কিছু ঘটলো এতোই দ্রুত যে, মেয়েটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। পুলক ডাক্তারের টেবিলের উপর বসলো। মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললো,
'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো? যান গিয়ে দেখেন, ডাক্তার আপনার বাবার চিকিৎসা করছে কিনা। আমি আছি। চিকিৎসা না করলে ডাকবেন।'
মেয়েটি দ্রুত চলে গেল। আরএমও'র রুমের বাইরে একটা চাপা গুঞ্জণ শুরু হয়ে গেল। পুলক বাইরের গুঞ্জণ নিয়ে মাথা ঘামালো না। ঠান্ডু নিজের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বললো,
'বস, শালা, ডাক্তাররে এতো সহজেই ছাইড়া দিলেন? আমার ইচ্ছা করতাছিল, ওর মুখে পেচ্ছাব কইরা দেই। ডাক্তারের মুখে গরম পেচ্ছাব! হা-হা-হা।'
'শাট-আপ! যা তোরা বাইরে যা। বাইরের কী অবস্থা, ওয়াচ্ কর।'
পুলকের ধমকে চুপসে গেল ঠান্ডু। রহমত বেরিয়ে গেল রুম থেকে। ওকে অনুসরণ করলো ঠান্ডু।
পুলক ডাক্তারের ফেলে যাওয়া সিনে ম্যাগাজিনটা তুলে পাতা উল্টাতে লাগলো। ম্যাগাজিন জুড়ে শো-বিজ তারকাদের নিয়ে রগরগে ছবি আর নানা গল্পের ফানুস। ও ডুবে যেতে লাগলো ওসব গল্পে। প্রায় বিশ মিনিট পর পুলকের মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রহমতের ফোন। ও ফোন অন করলো।
'হ্যালো..।'
'বস, জলদি কাইট্যা পড়েন!'
'কেনো?'
'মামুরা আইসা পড়ছে!'
'পুলিশ!'
'হ। ঐ ডাক্তার শালা পুলিশরে খবর দিছে। ইমার্জেন্সীতে দেখলাম, পুলিশ ঐ মাইয়ার সাথে কথা বলতাছে।'
'মেয়েটি পুলিশকে কী বললো?'

‘আপনে যে ডাক্তাররে মারছেন, সম্ভবত ঐ মাইয়া পুলিশের কাছে স্বাক্ষী দিছে!’
‘বলিস কী! সত্যি!’
‘সত্যি! আপনি তাড়াতাড়ি ফোটেন!’
তড়িঘড়ি টেবিল থেকে লাফিয়ে নামলো পুলক। কিন্তু পালাতে পারলো না ও। ততক্ষণে পুলিশ এসে ঘেরাও করে ফেলেলো আরএমও’র অফিস। দরোজার সামনে একদল পুলিশ দেখতে পেল ও। পুলক মুহূর্তেই বুঝে নিল পুলিশের বেষ্টনী থেকে ও এখন পালাতে পারবে না। সুতরাং, ও পালানোর চেষ্টা করলো না। ও দু’হাত তুলে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করলো। ও তেমন ভয় পেল না। ও জানে, খুব তাড়াতাড়ি ও বের হয়ে আসবে থানার হাজত কিংবা জেল থেকে। তখন ও দেখে নেবে ডাক্তার আর ঐ অকৃতজ্ঞ মেয়েটিকে। বেঈমানদের একটা শিক্ষা দিবে ও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো ও।

২

বাড়িটায় এখন সুনসান নীরবতা। ছোট্ট বাড়ি। ছোট্ট উঠোন। এই বাড়ি থেকে উঠোন পর্যন্ত একটা শূন্যতা জমে আছে। এই শুন্যতা যেমন গভীর, তেমনি অস্থিত্বময়। এ ধরনের শুন্যতাকে ইচ্ছা করলেই ঝেড়ে ফেলে দেয়া যায় না। একজনের শূন্যতা বাড়িটিতে জমাট বেঁধে আছে। গতকালও এই বাড়িতে একজনের উপস্থিতি ছিল। তার থেমে থেমে খুক্ খুক্ কাশির শব্দ ছিল। আক্ষেপ ছিল, দীর্ঘশ্বাসও ছিল। আজ নেই। অমোঘ মৃত্যু বদলে দিয়েছে দৃশ্যপট। জলির বাবা জামাল উদ্দিন গতকাল মারা গেছেন হাসপাতালে। প্রথম স্ট্রেকেই পরপারে চলে গেলেন তিনি। বাবার আকস্মিক মৃত্যুকে মানতে পারছে না জলি। বাবাই ছিল ওর একমাত্র অভিবাবক। ওর এক মামা আছেন। থাকেন নীলফামারীতে। তিনি বিয়ে করে শ্বশুড়বাড়িতে থিতু হয়েছেন। মামার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ খুব একটা নেই। তাই কার্যত সংসারে বাবা ছাড়া আপন বলতে ওর আর তেমন কেউ নেই। বাবার মৃত্যু একেবারেই নিঃসঙ্গ এবং অসহায় করে দিয়েছে ওকে। ডাক্তার সময়মতো চিকিৎসা করলে হয়তো ওর বাবাকে বাঁচানো যেত। এ নিয়ে জলির আফসোসের শেষ নেই। ও এখন কীভাবে থাকবে এবং কী করবে এই দুঃশ্চিন্তা ওকে তাড়া করে ফেরার কথা। প্রতিবেশীরা ওকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছে। কিন্তু জলির মধ্যে এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তার ছায়া নেই। কারণ, ও জীবনমৃত একজন মানুষ। ও শুধু বেঁচে আছে। বাবাকে হারিয়ে ওর হারাবার মত এখন আর কিছুই নেই। জলি বসে আছে ওদের বাড়ির বারান্দায়। তীর্যক রোদের বিকেল নেমে এসেছে বাড়ির আঙিনায়। দখিনা বাতাস থেমে থেমে আছড়ে পড়ছে গাছের ডালে, বাড়ির চালে, খোলা আঙিনায়। আজ ভ্যাপসা গরম নেই। বাতাসে মৌ মৌ গন্ধ। কিন্তু জলির ইন্দ্রীয়তে শুধু আগরবাতির গন্ধ। জলির বাবার মরদেহ কবর দেয়া হয়েছে দুপুরে। মরা বাড়ির আগরবাতির পবিত্র গন্ধ সহজে সরতে চা না। তীব্র হাহাকার ভরা মনে জলি ভাবছিল, বাড়ির উঠোনে ওর বাবা আর পায়চারী করবেন না। বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়বেন না। জলিকে একটা

সৎ পাত্রের কাছে বিয়ে দেবার স্বপ্ন নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথার জালও বুনবেন না। এইতো পরশু ওর বাবা জলিকে ডেকে বলছিলেন,

'তোকে একটা সৎ পাত্রের দেখে বিয়ে দিতে পারলেই আমার শান্তি। নইলে মরেও শান্তি পাবো না।'

জলি রান্না করছিল রান্নাঘরে। ও রান্নাঘর থেকে বললো,

'বাবা, সবাই মেয়েকে সৎ পাত্রের কাছে তুলে দিতে চায়। কোনো ছেলেকে সৎ মেয়ের কাছে তুলে দিতে চায় না কেন?'

প্রশ্নটি জলির মনে অনেকদিন থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ও বাবার কাছে জানতে চাইলো। জলির বাবা জামাল উদ্দিন জানেন, তার মেয়ে একটু অন্যরকম। সব কিছুর একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজতে চায়। নইলে বিপরীত দিক থেকে প্রশ্ন করে বসে। তিনি জবাবে বললেন,

'সমাজে এ রকমটাই চলে আসছে, মা। আমরা সে পথটাকেই অনুসরণ করে যাচ্ছি।'

'সেটাই তো জানতে চাই, তোমরা কোনো প্রশ্ন না করে কেবল একটা ধারাকে অনুসরণ করে যাচ্ছো। একবারও ভাবছো না, এর যৌক্তিকতা কী। উল্টোদিক থেকে তোমরা চিন্তা করে দেখতো চাও না। কেনো?'

বিয়ের প্রসঙ্গ এলেই জলি নানাভাবে বাবার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত। ওর বিয়ের ব্যাপারে ওর বাবাকে নিরুৎসাহিত করতেই ও নানা প্রশ্ন করতো। জামাল উদ্দিন মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করলেও মেয়ের প্রশ্নবাণে এক পর্যায়ে চুপসে যেতেন। জলি এখন ভাবছে,ওর বাবা আর ওর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলবে না। জলিও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে না বাবাকে। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'কীরে,মা, সারাদিন অমন মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে? হায়াত-মউত হচ্ছে আল্লাহ-র হাতে।'

হাসিনা খালার কথায় নিজের চিন্তায় ছেদ কাটে। হাসিনা খালা হচ্ছে জলিদের প্রতিবেশী। জলিকে সন্তানের মতই স্নেহ করেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহময়ী এক নারী। তার অভাবের সংসার। ভালো কিছু রান্না করলেই তিনি জলির জন্য নিয়ে আসবেন। গত শনিবার এক বাটি ইলিশ মাছের তরকারি এনে তিনি বললেন,

'দেখতো মা, পিয়াজ দিয়ে ইলিশ মাছের দোপেয়াজী রান্নাটা কেমন হইছে? একটু খাইয়া দেখ। এক টুকরা মাছ আনছি। ভালো লাগলে আরো দিয়া যামু নে।'

জলি জানে, তাদের ইলিশ মাছ কেনার তেমন সামর্থ্য নেই। ডাল-ভাত যোগাড় করতেই তারা হিমসিম খায়। ও বললো,

'খালা, তোমাকে না বলেছি, আমার জন্য তুমি কিছু আনবে না।'

'আহা, তুই এমন করতাছস কেন্? তোর খালু আজ একটা বড় সাইজের পদ্মার ইলিশ নিয়ে আইসা বললো, মানুর মা, ইলিশ মাছটা পিয়াজ দিয়া ভালো কাইরা রান্না করো। অনেকদিন ধইরা পাইন্যা খোলা খাইনা। এ কথা বইল্যা তিনি খালঘাটে গোসল করতে গেলেন। আমি যত্ন কইরা রান্না করলাম। তোরে ছাড়া কী, এই মাছ আমি খাইতে পারি?'

জলি জানে, এসব হাসিনা খালার বানানো কথা। তার স্বামী জমির আলী কোনো কাজ করেন না। সে হাটে হাটে-গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। বাড়ি ফিরেন কখনো এক মাস , কখনো দু' মাস বা কখনো তিন মাস পর। গ্রামে গ্রামে পালা গানের আসরে তিনি ঢোল বাজান। তাকে ঢোলক হিসাবে সকলে চেনে। তার উপার্জন খুবই সামান্য। হাসিনা খালার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই আছে। তার পঁচিশ বছর বয়সী একটি ছেলে আছে। নাম মানু। মানু বখে গেছে। জুয়ার আসরেই পড়ে থাকে সে। বাড়ি ফিরে মধ্যরাতে। সংসারে কোনো সহযোগিতা সে করে না। হাসিনা খালা রাইস মিলে ধান শুকানোর কাজ করে সংসারটা চালাচ্ছেন। তার মিথ্যা বলাটা জলি খুব সহজেই ধরতে পারে। তিনি যখন মিথ্যা কথা বলেন, তখন হরহর করে কথা বলে ফেলেন। মিথ্যা কথা বলতে হলে হরহর করেই বলতে হয়। নইলে সত্য কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। জলি মুচকি হেসে বললো,

'খালা, তোমার বড় ইলিশ মাছটার কতগুলো টুকরো হয়েছে, শুনি?'

এ কথায় দ্বন্দ্বে পড়ে গেল হাসিনা বেগম। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন বড় একটা ইলিশ মাছের কতগুলো টুকরো হতে পারে। খালার তাৎক্ষণিক জবাব না পেয়ে জলি বললো,

'এবার সত্যি করে বলো তো, কত টুকরো মাছ কিনেছো? এবং কত টাকা দিয়ে?'

এ কথায় ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলেন হাসিনা বেগম। জলির কাছে তিনি মিথ্য বললেই ধরা পড়ে যান। তিনি আমতা আমতা করে বললেন,

'তুই যে কী! শোন, কাল রাইতে তোর খালুজান বাড়ি ফিরেছে। সকালে ভাবলাম, অনেকদিন পর তিনি বাড়ি ফিরলেন, তাকে ভালো-মন্দ কিছু রান্না কইরা খাওয়াই। গেলাম বাজারে। মাছের যে দাম! ইলিশ মাছের চার টুকরা কিইন্যা আনলাম পচিশ ট্যাকা দিয়া! তোর খালু ইলিশ মাছ খুব পছন্দ করে, বুঝলি মা?'

'যে লোকটা তোমার খোঁজ-খবর ঠিক মত রাখে না। ভরণ-পোষন দেয় না। তাকে তুমি ইলিশ মাছ খাওয়াচ্ছো!'

'মারে, স্বামী বইল্যা কথা। স্বামীর উপর রাগ করতে নাই।'

হাসিনা খালার পতিভক্তি দেখে অবাক হয় জলি। যে পুরুষ মানুষটার দায়িত্ব জ্ঞান নেই, তারই সামনে অপরিসীম শ্রদ্ধায় মোমের মত গলে পড়ছে সে।

জলির কোনো জবাব না পেয়ে হাসিনা বেগম সান্তনা দেবার গলায় ফের বললো,

'মনটারে শক্ত কর, মা। আল্লাহ্-র মাল আল্লাহই নিয়া গেছে! তুই না খাইয়া, পাথর হইয়া বইস্যা থাকিস না।'

তার শান্তনার কথায় স্মৃতিচারণ থেকে ফিরে আসে জলি। ও বলে,

'খালা, আমার মন অনেক শক্ত। অ-নে-ক শক্ত!'

হাসিনা বেগম জলির কাছে গিয়ে বসে। জলির মাথা টেনে নেয় নিজের বুকে। আবেগ কাঁপা কণ্ঠে বলে,

'তোর জন্য খুব চিন্তার মধ্যে আছি, মা। তুই এখন একা কীভাবে থাকবি?'

'কেনো? একা থাকতে অসুবিধা কোথায়, খালা?'

‘না, মা। তুই একা থাকতে পারবি না। মাইয়া মানুষ একলা থাকতে পারে না। অনেক সমস্যা হয়! আইজ থেইক্যা আমি তোর লগে ঘুমামু। তুই চিন্তা করিস না।’
হাসিনা খালার এ কথার কোনো জবাব দেয় না ও। হাসিনা খালা জানে না, ও কথটা সাহসী কিংবা নিজের জীবন নিয়ে কতটা উদাসীন। ওর হারানোর কী আছে? হাসিনা বেগম ওর মাথায় বিলি কাটতে কাটতে বলে,
‘তোর এখন বিয়া হওয়া দরকার।’
এ কথায় ভীষণ চমকে উঠে জলি। ও বলে,
‘বিয়ে! তুমিও দেখছি, বাবার মতো শুরু করলে..!’
‘কেনো, তোর কী বিয়ে হইবো না? বিএ পাশ কইরা ঘরে বইসা আছোস। তুই কী দেখতে অসুন্দর? তুই তো অনেক সুন্দর। ডানা কাটা পরী! তোর বিয়া হইবো না কেন্? ’
‘খালা, আমি কখনো বিয়ে করবো না।’
‘কোনো, মা!’
‘পুরুষ মানুষকে আমি ঘৃণা করি!’
‘বলিস কী!’
‘হ, খালা। বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি আর কখনো কথা বলো না।’
‘কিন্তু তোর মামা তো বিয়ে ঠিক করেছেন। তিনি তো তোকে নিয়ে যাবেন, শুনেছি।’
‘মামা! আমার বিয়ে ঠিক করেছেন!’
‘তাইতো শুনেছিলাম, মা।’
‘কার কাছে?’
‘তোর বাবার কাছে। গত সপ্তাহেই তিনি আমাকে ডাইক্যা বলছিলেন যে, তোর মামাকে তিনি চিঠি লিইখ্যা দিছেন।’
‘তাই নাকি!’
‘হ,মা। তোর মামা নাকি তোর জন্য একটা ছেলে ঠিক করেছেন।’
‘কিন্তু, বাবা তো আমাকে কিছুই বলেন নি!’
‘আমাকেও বলছিলেন যে, আমি যেন তোকে এসব কিছু না বলি।’
হাসিনা খালার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল জলি। ও আর কোনো কথা বললো না। ওর বাবা কী বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি চলে যাবেন পরপারে? আশংকা থেকেই কি চিঠি লিখেছিলেন ওর মামাকে আসতে? প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে লাগলো ওর মনে। বাবার মৃতুর খবরটা ও আজ সকালে ওর মামাকে জানিয়ে দিয়েছে টেলিফোন করে। নিশ্চয় ওর মামা রওনা হয়ে গেছেন। যে কোনো সময় ওর মামা এসে পড়তে পারেন। তিনি কি জলিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবেন? তার সংসারে জলি কি ভারবাহী হয়ে যাবে না? প্রশ্নগুলো নিয়ে ডুবে গেল জলি। হাসিনা বেগম গভীর মনযোগে জলির মাথা বিলি কেটে যাচ্ছেন। চুলে বিলি কাটার কাজটি নারীদের চমৎকার মানিয়ে যায়।

৩

ঠান্ডু বললো,

‘বস্, এ মাইয়ার স্বাক্ষীতে আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশীট তৈরি করতাছে! শালী, একটা অকৃতজ্ঞ হারামজাদী! আপনে যার ল্যাইগ্যা এতো কিছু করলেন, সে-ই কিনা আপনেরে ফাসাইয়া দিলো?’

পুলকের মুখে কোনো কথা জোগালো না। ও বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে যায়। মেয়েটির বাবার জন্য ও ডাক্তারকে মারলো, আর সেই মেয়েটিই ওর বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিয়েছে! মানুষ এতোটা অকৃতজ্ঞ হয়? পুলক কখনো মানুষ খুন করেনি এবং কাউকে খুন করার কথা ভাবেওনি। কিন্তু এই মুহূর্তে পুলকের মনে হলো মেয়েটিকে খুন করতে পারলে ভালো হতো। এ কথা ভাবতেই ও মেয়েটিকে খুন করবে বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল। জেল থেকে বের হয়ে ও খুনটি করবে। মাস্তানীর লাইনে ‘খুন’ একটা বিরাট ব্যাপার। এ লাইনে খুনীর ‘তকমা’ নাম-যশ দুটোই বাড়িয়ে দেয়। তবে পুলক এ ধরনের তকমার জন্য মেয়েটিকে খুন করবে না। একটা বেপরোয়া শোধ নেবার জন্যই খুনটা করা দরকার। কাজটি অনেক কঠিন হলেও, তা করতে হবে। অকৃতজ্ঞদের একটা যুতসই জবাব দেয়া দরকার। পুলকের চিন্তামগ্নতা লক্ষ্য করে ঠান্ডু খুক্ খুক্ করে কাশলো। এরপর বললো,

‘বস্! আপনের ব্যাপারে বিগবস্ এখন মাথা ঘামাইতে চায় না। শুধু বলে, ‘দেখতাছি’! আমারে সেদিন বইলা দিছে, আমি যেন আপনার ব্যাপারে আর কোন কথা না কই।’

কথা শেষ করে ঠান্ডু আবার খুক্ খুক্ করে কাশলো। পুলক চুপ করে রইলো। ও জেলখানার লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি অবনত। দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা হতাশার ছায়া ও দেখাতে চায় না ঠান্ডুকে। ঠান্ডু ওর বিশ্বস্থ সাগরেদ ঠিক, তবুও নিজের অসহায়ত্ব ও প্রকাশ করতে চায় না। পুলকের নীরবতা দেখে ঠান্ডু আক্ষেপের গলায় বললো,

‘আপনে যে কেন ছাড়া পাইতাছেন না, জানি না! একটা থাপ্পড়ের এমন খেসারত, ভাবতেই পারতাছি না! শালার, কত লোকেরে ফুটা কইরা দিলাম! কিছুই তো হইলো না!’

পুলক এরও কোন জবাব দিল না। এর জাবাব ওর নিজেরও জানা নেই। সত্যিই, এ পর্যন্ত ও অনেককেই চড়-থাপ্পড় মেরেছে। অস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখিয়েছে। এমন কী, অপহরণও করেছে। কেউ কিছুই করতে পারেনি ওর। অথচ হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে চড় মেরে ও বিপাকে পড়ে গেছে। এই প্রথম ঘোরপ্যাঁচে আটকে গেছে ও। পঁচা শামুকে পা কেটে গেছে। পুলকের বুক ছাপিয়ে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ঠান্ডু বলে,

‘বস্, অর্ডার দেন, ঐ ডাক্তার শালারে রাস্তায় ধইরা ফুটা কইরা দেই! ওর একটা অন্ডকোষ কাইট্যা নিমু? নইলে ওর ছেলে-মেয়েরা অপহরণ কইরা আটকাইয়া রাখি! মামলা তুইলা নিলে ছাইড়া দিমু।’

পুলক জানে, ঠান্ডুর এ সব-ই কথার কথা। ও এ সব কিছুই করতে পারবে না। ও অতোটা সাহসী নয়। পুলক পাশে থাকলেই ও সাহসী হয়ে ওঠে বা সাহসের ভাব দেখায়। প্রকৃত

অর্থে ও একটা ভীতুর ডিম। ঠান্ডুকে ও ভালো করে চেনে। পুলককে যারা ভয় পায়, ঠান্ডুকেও তারা ভয় পায় । অনেকটা সূর্যের আলোয় চাঁদের আলোকিত হবার মত। ঠান্ডু পুলকের কাছ থেকে একটা জবাব আশা করছে। ও তাকিয়ে আছে পুলকের মুখের দিকে। জেলখানায় দর্শনার্থীদের করিডোরে মানুষের জটলা লেগেই থাকে। আজও মানুষের জটলা। হৈ-চৈ। এর মধ্যেই কথা বলতে হয়। পুলকের এমন হৈ-চৈ ভালো লাগে না। কিন্তু অনেকদিন পর ঠান্ডু এসেছে। ওর সাথে কথা বলা দরকার। পুলক চোখ তুলে তাকালো ঠান্ডুর দিকে। বললো,

'ভালো একটা উকিল ধর। এই উকিল দিয়েও হবে না, দেখছি।'

'ওস্তাদ, এই পর্যন্ত চারবার উকিল বদলাইলাম। এই শহরের ক্রমিন্যাল মামলার নামকরা উকিলই তো ধরছি!'

'তা ঠিক। কিন্তু..!'

'উকিল সাহেব বলেছেন, উপর থেইক্যা জোর তদবির চলতাছে! তাই, তিনি সুবিধা করতে পারতেছেন না।'

এ কথা এর আগেও শুনেছে পুলক। ওর বিরুদ্ধে উপর মহল থেকে তদবির চলছে। ওকে এবার লড়তে হচ্ছে আইন ব্যবহারকারী নেপথ্য শক্তির সঙ্গে। ও আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। ঠান্ডু বলে,

'ডাক্তার শালারে ধরমু?'

'না।'

'তাহলে এখন কী করমু? কোনো নির্দেশ দেবেন?'

ঠান্ডুর প্রশ্নের জবাবে পুলক বললো,

'ঐ মেয়েটার নাম যেন কী বললি?'

'জলি। ওর বাপটা ঐ দিন হাসপাতালে মইরা গেছে, বস!'

'বলিস কী!'

'হ, বস। আমি ঠিকই কইতাছি।'

এ কথায় পুলকের মনটা কেমন কাতর হয়ে গেল। কিন্তু এই আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। তবে শোধ নেয়া হবে না। মেয়েটির অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নিতেই হবে। পুলক ঠান্ডুর উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেবার গলায় বললো,

'ওকে ওয়াচে রাখিস।'

'বস, ঐ জলি মাগীটার কথা বলতাছেন!'

'শাট আপ! তোকে না বলেছি, মেয়েদের গালি দিয়ে কথা বলবি না!'

পুলকের গলা রাগে গমগম করে ওঠে। এতে ভড়কে যায় ঠান্ডু। ও নিজের জিভ এমনভাবে কাটে, যেন ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি বলে,

'সরি,বস। আমার ভুল হয়ে গেছে।'

ঠান্ডু জানে, পুলক মেয়ে মানুষদের গালিগালাজ দেয়া পছন্দ করে না। ঠান্ডু আবার মেয়ে মানুষদের গালি না দিয়ে কথা বলতে পারে না। তাই মুখ ফসকে গালি বেরিয়ে যায়। কবিরা কেন যে মেয়েদের ফুলের সাথে তুলনা করেন, এটা ঠিক বুঝে ওঠতে পারে না ও। মেয়েরা কি ফুল? বরং হুল বা শূল বলা যায়। মেয়েদের নিয়ে ঠান্ডুর মনে অনেক পঞ্জুভূত রাগ। মেয়েদের গালি দিয়ে কথা বলার প্রবণতার জন্য ও এর আগেও পুলকের যথেষ্ট গালাগাল খেয়েছে। আজও মুখ সামলে রাখতে পারে নি। ও কাঁচুমাচু করে ফের বললো,

‘বস্, জলিকে কী করবো বললেন?’

‘ওকে ওয়াচে রাখিস। ওর সাথে আমার বোঝাপড়া আছে।’

ঠান্ডু উৎসাহী গলায় বললো,

‘বস্, অর্ডার দেন, জলির মুখে এসিড মাইরা দেই! কড়া এসিড! আমার কাছে আছে!’

‘না, তোকে এ সব কিছু করতে হবে না। তুই শুধু ওকে ওয়াচে রাখবি। যা করার আমিই করবো।’

পুলক ঠান্ডা গলায় এ কথা বললো। ঠান্ডু বুঝতে পারছে ওর বস্ জলির উপর ভীষণ খেপেছেন। মেয়েদের ব্যাপারে বস্ বরাবরই উদাসীন। মেয়ে নিয়ে বসের রাগ বা অনুরাগ কোনটাই দেখেনি ও। এখন মনে হচ্ছে ওর বস্ এই প্রথমবারের মত একজন নারীর উপর ভয়ানক খেপেছেন। এটা ওর ভালো লাগছে। অন্তত একটা মেয়ে মানুষের ক্ষতি হলেও মন্দ কি? ঠান্ডু বিগলিত হয়ে বললো,

‘বস্, চিন্তা কইরেন না। জলির পেছনে ছায়ার মত লাইগ্যা থাকমু। আপনে ছাড়া পাইলেই মাগীরে..!’

এ পর্যন্ত বলেই পুলকের রাঙা চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় ও।

‘সরি, বস্!’

‘তুই এখন যা।’

‘আচ্ছা। আসি বস্।’

ঠান্ডু বিব্রত মনে চলে গেল। পুলক পা বাড়ালো জেলের ভেতরে। জেলের আঙিনায় এসে হাঁটার সময় ও আকাশের দিকে তাকালো। জেলখানার আকাশটা অনেক ছোট। এই ছোট আকাশ দেখতে পুলকের একদম ভালো লাগে না। বিশালত্বের মহিমা নিয়েই তো আকাশ! জেলখানার চার দেয়ালের সীমরেখায় আকাশটা ভীষণ ছোট দেখায়। অবশ্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের আকাশটা বড়। জেলা শহরের জেলখানা ছোট হয়। এ সব জেলখানার আকাশও ছোট। ছোট আকাশের দিকে তাকালে পুলকের মনটাও কেমন ছোট হয়ে যায়। তাই ও খুব একটা আকাশের দিকে তাকায় না। জেলখানার আঙিনায় হাঁটার সময় ও মাথা নিচু করে হাঁটে। এতে অনেকে মনে করে ও খুব বিনয়ী। আসলে জেলখানায় যারা আসে, তারা খুব একটা বিনয়ী হয়না। সাধারণত অপরাধীরাই জেলখানার বাসিন্দা হয়। তবে নিরাপরাধ লোকও আসতে হয় এখানে। কেউ মিথ্যা মামলায়, কেউবা বিনা বিচারে জেলখানার চারদেয়ালে বন্দি হয়ে থাকে। পুলক যতবারই জেলে এসেছে, ততবারই এ ধরনের লোক

দেখেছে। প্রথম প্রথম ওদের অকারণে জেলবাসের করুণ কাহিনী শুনে ওর মন খারাপ হতো। এখন আর হয়না। সব জেলের একই চালচিত্র। পুলক জানে, অর্থ ও পেছনে শক্তি থাকলে হাজারটা মামলা থাকলেও জেল থেকে বের হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। আবার অর্থ বা নেপথ্য শক্তি না থাকলে নিরাপরাধীরও রেহাই নেই। পুলকের পেছনে একজন রাজনীতিবিদ আছেন। তিনি পুলককে শেল্টার দেন। জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন। তবে পুলকের এবারের জেলবাসের সময়টা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সেটাও নেপথ্য শক্তির লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ার কারণে। তুচ্ছ ঘটনায় ওকে কারাবাসের দীর্ঘ নিঃসঙ্গতায় থাকতে হচ্ছে। এতোটা দিন ও কখনো জেলে থাকেনি। অথচ গত বছর একটি খুনের মামালা থেকে কত সহজেই ও বেরিয়ে এসেছে। হোক তা মিথ্যা মামলা। ৩০২ ধারার মামলায় জড়িয়ে গেলে অনেক হুজ্জুত। পুলকও এই হুজ্জুতে জড়িয়ে ছিল, আবার বেরিয়ে এসেছিল জলের মত। কিন্তু এবার ভিন্ন কথা। একজন কসাই শ্রেণীর ডাক্তারকে ও একটা চড় মারার খেসারত দিচ্ছে। এ মামলাটি প্রথমে ও পাত্তাই দেয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে যাচ্ছে। তিনমাস যাবত ও জেলখানায় আটকে আছে। জামিন তো হচ্ছেই না, বরং এ মামলায় ফেঁসে যাবার আশংকা বাড়ছে। পুলকের সময়টা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। ওর নেপথ্যের শক্তিদাতাও ওর ওপর থেকে সাহায্যের হাত সরিয়ে নিচ্ছে। বিপদ বুঝে একে একে সটকে পড়ছে সহযোগিরা। সময় খারাপ হলে এমনই হয়। কোমড়ের বিছা সাপ হয়ে কামড়াতে চায়। পুলক তা জানে।

৪

টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আষাঢ় মাসের শুরু। সন্ধ্যার আকাশ জুড়ে থোকা থোকা জমাট কালো মেঘ । আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে যে কোন সময় ঝর ঝরিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে আসবে। কিন্তু মূষল ধারে বৃষ্টি নামছে না। বিকেল থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। ঝর ঝরিয়ে বৃষ্টি নামলে জলি ছাতা গুটিয়ে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতো। ‘টিপ টিপ বৃষ্টিতে কোন মানে হয় না’ ভাবে জলি। ও পা টিপে টিপে হাঁটছে। চারপাশে ঝেঁকে বসেছে অন্ধকার। সবে সন্ধ্যা। অথচ রাতের নিঃস্তব্ধতা নেমে এসেছে। জলি ডান হাতে মাথায় ছাতা ধরে হাঁটছে । ছাতার কারণে বৃষ্টি থেকে শরীর রেহাই পেলেও ওর হাঁটুর নিচের অংশের শাড়ি ভিজে গেছে। গোয়াল পাড়া থেকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আসতে তিরিশ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু আজ পথ যেন ফুরাচ্ছে না। তিরিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ও এখনো বাড়িতে পৌঁছুতে পারেনি। কমপক্ষে আরো দশ মিনিট লাগবে বাড়ি পৌঁছুতে। জলি মনে মনে হিসাব করে নেয়। ছাতা দিয়ে বৃষ্টির সবটুকু ঝাপটা ঠেকাতে পারছে না ও। শাড়ি ভিজছে। গায়ে বৃষ্টি জলের ঝাপটা এসে লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে ও ভাবে, বৃষ্টির একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। ঐশ্বরিক স্পর্শ আছে! বৃষ্টির স্পর্শে সবাই কেমন আপ্লূত হয়ে যায়। ধনী বা দরিদ্র, সুখী বা অসুখী, সুস্থ বা রোগী, কবি কিংবা অ-কবি সকলেই বৃষ্টি পছন্দ করেন। সময়ে-অসময়ে তারা

বৃষ্টিতে ভিজে মুখর হন। বৃষ্টিকে মানুষ তাই এতো পছন্দ করে। একটা কুকুর হঠাৎ জলির সামনে দিয়ে দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। এতে একটু ভড়কে গেল ও। আর ঠিক তখুনিই জলির উপর আছড়ে পড়লো ঝড়ো দমকা বাতাস। এক পলকে ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে নিল ওর ছাতা। ও শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করলো। শাড়ি ঠিক করে জলি ছাতা খুঁজতে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালো। এ সময় ও একটি কালো ছায়া দেখে ভীষণ চমকে উঠলো। ওর গা শিউরে উঠলো। ছায়াটি ওর মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত নড়লো না। জলি ছায়াটির দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই ছায়াটি নড়ে উঠলো এবং ছায়াটি ওর সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। প্রচন্ড রাগ আর ঘৃণার রি রি করে উঠলো জলির শরীর। ও কাঁপতে লাগলো। প্রায় দু' বছর ধরে এই ঘৃণার কাঁপন নিয়ে বিবর্ণ ফুলের মতো ও বেঁচে আছে। ঠিক বেঁচে আছে বলেও জলির মনে হয়না। ওর মনে হয় ও বেঁচে থাকা একজন জীবনমৃত মানুষ। নোংরা একটি মানুষের ছায়া ওর সামনে এগিয়ে আসছে। এই নোংরা মানুষটি একদিন ওর উনিশ বছরের জীবনকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। ওর কিশোরী জীবনের অপার সৌন্দর্য নষ্ট করে তাতে এঁকে দিয়েছে বিভৎস ও কদর্য রূপ। অপমান আর গ্লানির দগদগে ক্ষতে ওর মনের সুকুমার আবেগ পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে । অবসাদ আর গাঢ় বিষণ্নতায় ও হয়ে গেছে একখন্ড লাবণ্যহীন বিষণ্ন পাথর। এতোদিন পর ঐ নোংরা মানুষটি ওর দিকে এগিয়ে আসছে! লোকটি ওর খুব কাছে চলে এলো। জলি নিজেকে শক্ত করে নিল। ও জানে, এই অশুভ লোকটির কোনো উদ্দেশ্য আছে। একে শক্তভাবে মোকাবেলা করতে হবে। জলি উঁচু কণ্ঠে বললো,

'কে ওখানে?'

লোকটি একটু থামলো। এরপর আরেকটু এগিয়ে এলো। নিহার গায়েনকে স্পষ্ট দেখতে পেল জলি। নিহার গায়েনের জেলে থাকার কথা। তার সাত বছরের কারাদন্ড হয়েছিল। সাজাপ্রাপ্ত আসামী সাজার মেয়াদ ফুরাবার আগেই ছাড়া পেল কীভাবে? এই প্রশ্নে জলির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। নিহার গায়েন জলির প্রশ্নটি যেন বুঝতে পারলো। এর জবাব নিজে থেকেই দিয়ে সে বললো,

'হাইকোর্টে রীট করে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ট্যাকা খরচ করলে সাজাপ্রাপ্ত আসামীর জেল থেকে বের হওয়া নতুন কিছু নয়। ফাঁসির আসামীর ফাঁসিও মাফ হয় এই দ্যাশে।'

উৎফুল্ল গলায় কথাগুলো বলে মাথার চুল ঠিক করে নিল সে। তার চুলগুলো বৃষ্টির পানিতে ভিজে নেতিয়ে আছে। নিহার গায়েনের কথাগুলো তীরের মতো বিদ্ধ হলো জলির ইন্দ্রীয়তে। ও রাগী গলায় নিহার গায়েনের উদ্দেশ্যে বললো,

'তো, এখানে কী চাই?'

'না, মানে, তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

নিহার গায়েন খুবই নিচু গলায় জবাব দিল। সে কথা বলার এক ফাঁকে মাথার চুলগুলো আরেকবার ঠিক করে নেয়ার চেষ্টা করলো। জলি গলায় রাগ ধরে রেখে বললো,

'আমি কোনো জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলি না।'

'কিন্তু আমার কথা বলার ছিল।'

'ইতর- ছোটলোক! তোর সঙ্গে কিসের কথা? আমার সাথে আর কোনদিন কথা বলার চেষ্টা করলে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ফেলবো!'

'না, মানে, বলছিলাম কি, আমরা কি..?'

'আর একটি কথাও নয়। দূর হ, হারামজাদা!'

জলির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিহার গায়েন একটু গাবড়ে গেল। সে আর কোনো কথা বললো না। জলির ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে চুপসে সে দু' পা পিছিয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে ফের মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। জলি কয়েকটা মুহূর্ত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার উপর। ওর ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ও কান্না সামলে নেবার চেষ্টা করলো। ও জানে, নিহার গায়েন এখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওকে দেখছে। নিহার গায়েনকে ওর কান্না দেখাতে চায় না ও। বৃষ্টিস্নাত এই সন্ধ্যায় ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিনের সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা। ওর সব হারানোর কথা। ওর একান্ত তীব্র লজ্জা আর ঘৃণার কথা।

প্রায় দু' বছর আগের কথা। জলি তখন অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ওর বাবার পোষ্টিং ছিল ময়মনসিংহে। ফলে জলি ওর বাবার সঙ্গে ময়মনসিংহ শহরে থাকতো। গানে জলির গলা ভালো ছিল। শিশু বয়স থেকেই ওর গানের প্রতি দুর্বলতা। মায়ের কঠিন আপত্তির কারণে ও গান শিখতে পারেনি। চৌদ্দ বছর বয়সে জলি ওর মাকে হারায়। মায়ের ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। অসুখ ধরা পড়ার চার মাসের মধ্যে ওর মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সংসারের দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেয় জলি। এইচএসসি পাশ করার পর জলি গান শেখার বায়না ধরে বাবার কাছে। ওর বাবা মেয়ের ইচ্ছা পূরণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মেয়ের জন্য গানের শিক্ষক হিসাবে নিহার গায়েনকে ঠিক করে দেন তিনি। কলেজ, সংসার আর সঙ্গীত চর্চায় বাঁধা পড়ে যায় জলির দিনলিপি। ময়মনসিংহ শহরে গানের মাষ্টার হিসাবে নিহার গায়েনের নাম-ডাক ভালোই ছিল। তার তত্ত্বাবধানে ও ভালোভাবেই গান শিখছিল। নিহার গায়েন সঙ্গীত ছাড়া কখনো জলির সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করেনি। ওর দিকে কখনো বিশেষ দৃষ্টিতেও তাকায়নি। গানের শিক্ষক হিসাবে জলি নিহার গায়েনকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু একদিন শ্রদ্ধার ব্যক্তিটির অন্য এক চেহারা দেখতে পেল জলি। মানুষ কতটা কদর্য হতে পারে, তা ও বুঝতে পারলো। এক ঝড়ো রাতে নিহার গায়েন ওর কিশোরী জীবনের স্নিগ্ধ সৌন্দযকে লন্ডভন্ড করে দিল। ওর জীবনের সবটুকু পবিত্রটা পুড়ে গেল কামনার কুৎসিত আগুনে। সেই বিপর্যস্ত রাতে কিশোরী জলি পৌঁছে গেল যেন বার্ধক্যে। এ যেন হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বৃন্ত থেকে ফুলের পাপড়ি ঝরার করুন বিপন্নতা। সে কথা মনে হলে এখনো ওর গা গুলিয়ে আসে। শরীরের প্রতিটি লোমকূপে রি-রি করে ওঠে ঘৃণা। তখন বেঁচে থাকাটা ওর কাছে নিদারুন পরিহাস বলেই মনে হয়। এই মুহূর্তে সে রাতের বিভৎস অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

জলি সেদিন রাতে নিহার গায়েনের সঙ্গে শহরের বাইরের একটি এলাকা থেকে ফিরছিল। গানের অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যায় শুরু হবার কথা থাকলেও রাত দশটায় শুরু হয়েছিল। জলি বাড়ি ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু ওর শিক্ষক নিহার গায়েন রাজী হলেন না। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। শিক্ষকের অনুরোধ ও ফেরতে পারেনি। ও সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পায় সাড়ে এগারটায়। ফলে প্রায় মধ্যরাতে বাড়ির দিকে রওনা দেয় জলি। ওর সঙ্গে ছিল নিহার গায়েন। তিনি সব সময়ই ছাত্রীকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। সেদিনও এলেন জলির সঙ্গে। তারা রিকসা চড়ে বাড়ি ফিরছিল। পথের মধ্যে হঠাৎ নিহার গায়েন জলিকে বললো,

'সামনেই আমার একজন ছাত্রীর বাড়ি। আমি সেখানে একটু নামতে চাই। আরেকটু দেরী হলে তোমার কী খুব অসুবিধা হবে?'

'স্যার, অনেক রাত হয়ে গেছে! বাবা, নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।'

জলি উদ্বেগ প্রকাশ করে। নিহার গায়েন বিনীত গলায় বলে,

'তা ঠিক। কিন্তু আমার ছাত্রীটি খুবই অসুস্থ। যাবার পথে ওকে একটু দেখে যেতে চাইছিলাম।'

'কাল এসে দেখে গেলে হয় না? আমার অনেক ভয় করছে, স্যার!'

'ভয় কিসের? আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।'

'তারপরও স্যার, আমার ভয় করছে। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, আমি পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করবো। রিকসা ছাড়ছি না। শুধু যাবার পথে ওদের বাড়িতে একটু নামবো। পথের মধ্যেই ওদের বাড়ি পড়বে। তুমি না করো না, প্লিজ।'

'স্যার! কিন্তু?'

'শিক্ষকের কথা রাখতে হয়।'

'বাবা, নিশ্চয়ই ছটফট করছেন! এমন দেরী তো কখনো হয়নি, স্যার!'

'তোমার বাবাকে আমি এর জবাব দেব। তুমি চিন্তা করো না।'

এর জবাবে জলি আর কিছুই বলতে পারেনা। ও চুপ করে থাকে। রাস্তার পাশে নির্জন এলাকায় একটি বাড়ির সামনে দিয়ে রিকসা যাবার সময় রিকসাওয়ালাকে রিকসা থামাতে বললো নিহার গায়েন। জলি চুপ করে রইলো। ওর ভয় আর অস্বস্থি বাড়তে থাকে। নিহার গায়েন রিকসা থেকে নেমে বাড়ির দরোজায় কড়া নাড়লো। দরোজায় যেন কেউ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। দরোজাটা খুলে দিল একজন মধ্যবয়স্ক লোক। লোকটি নিহার গায়েনকে সালাম দিয়ে দরোজা থেকে সরে দাঁড়ালো। নিহার গায়েন ঘরের ভেতরে চলে গেল। রিকসার উপর জলি অস্বস্থি নিয়ে এই দৃশ্য দেখলো। ও বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো। রিকসাওয়ালা বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করছিল। জলির বিরক্তি যখন তুঙ্গে, বাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে এলেন ঐ মধ্যবয়স্ক লোকটি। লোকটি রিকসার সামনে এসে জলির দিকে তাকিয়ে বললো,

'মা-জননী। আমার মেয়েটা জ্বরে ছটফট করছে। স্যার আপনাকে ডাকছেন। আপনি কি একটু বাড়ির ভেতরে আসবেন? আপনার স্যার আপনাকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি ভেতর যান, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।'
এমন একটি পরিবেশে এমন একটি প্রশ্নের জবাবে না বলা কি যায়? জলিও না বলতে পারলো না। ও বিরক্ত মনে রিকসা থেকে নামলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হা-করা দরোজার দিকে। জলি খোলা দরোজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। ড্রয়িং রুমে কাউকে দেখতে পেল না ও। ও ডাকলো,
'স্যার, আপনি কোথায়?'
অন্যরুম থেকে নিহার গায়েনের জবাব এলো,
'ভেতরে এসো। আমি এখানে।'
জলি ভেতরের রুমের দিকে পা বাড়ালো। ভেতরের রুমে গিয়ে জলি চমকে উঠলো। ও দেখতে পেল নিহার গায়েন লুঙ্গি পড়ে খালি গায়ে একটি চেয়ারে বসে আছেন। কেমন একটা গা ছমছম করা দৃষ্টি তার দু'চোখে। জলি ভীষণ রকম কেঁপে উঠলো। ঠিক তখনই, বাড়ির সদর দরোজা দরাম করে বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেল ও। সেদিন ঐ বাড়ির বন্ধ দরোজার ভেতরে কাঁচের টুকরোর মতো ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে গেল ও। জীবনের সবুজ রঙটুকু যেন হলদে বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ার্ত ছোবলে!
আজ এতোদিন পর নিহার গায়েনকে দেখে সব হারানোর কষ্টের কথা জলির শিরায়-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়লো। ওর মাথার উপর টিপ টিপ বৃষ্টির মুখরতা। বৃষ্টিতে ও ভিজছে। পথে ও দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভের মতো। যেন মহা প্রলয় হলেও টলবে না। ওর পেছনে হারিয়ে গেছে ছাতা, কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নিহার গায়েন নামক এক হিংস্র জানোয়ার। তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। বৃষ্টিস্নাত খোলা আকাশ মাথায় নিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে রইলো জলি, অনেকক্ষণ। এই সময়টুকুতে বৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে গেল ওর দু'চোখের অবিরল জলের ধারা।

৫

জলি বশির আহমেদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। ওর এই হাসিটা মেকী। মেয়েদের কোন হাসিটা মেকী আর কোন হাসিটা সত্যিকারের, তা অনেক পুরুষ ধরতে পারেন না। বশির আহমেদও সেরকম। তার চোখের বিশেষ চাহনি দেখেই ও বুঝতে পেরেছে, একে হাসি দিয়েই কাবু করা যাবে। ও বশির আহমেদের চোখে চোখ রেখে মুখে মেকী হাসি ধরে রাখে। মেকী হাসি আর সত্যিকারের হাসির মধ্যে ফারাকটাই বা কী, ও জানে না। ও জানতে চায়ও না। জলির জীবনে সত্য মিথ্যার কোন গুরুত্ব এখন নেই। ও জীবন মৃত একজন মানুষ। ওর কোন স্বপ্ন নেই, লক্ষ্য নেই। কোন চাওয়া নেই। পাওয়া নেই। আশা নেই কিংবা অক্ষেপও নেই। কোন কিছুতে আনন্দ বা হতাশা নেই। ওর কিছুই নেই। আছে শুধু জীবনটা। এই জীবন চলছে গন্তব্যহীন পথে। জগত সংসারের কোন কিছু নিয়ে ওর মাথা

ব্যথা নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর মাথাটা কেন জানি কাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে ও সচেষ্ট হয়েছে বা বলা যায় ওকে সচেষ্ট হতে হয়েছে। হঠাৎ ওর কিছু টাকার খুব প্রয়োজন হয়েছে। এই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ও একটা বিষয় থেকে আরেকটি বিষয় জড়িয়ে যাচ্ছে। বশির আহমেদ এজি অফিসের সহকারী হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তার কাছে আটকে আছে ওর বাবার পেনশনের ফাইল। ও তার কাছে এসেছে বাবার পেনশনের টাকা তুলতে। টাকাগুলো ওর ভীষণ প্রয়োজন। নিজের জন্য নয়,অন্য একজনের জন্য এই টাকাগুলো দরকার। কারো জন্য ওর কোন দরদ নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু হঠাৎ করে একটা দায়বোধের চাপ ও অনুভব করছে। এ কারণেই বাবার পেনশনের টাকাগুলো তোলার চেষ্টা করছে ও। নিজের প্রয়োজনে ও এই টাকা কোনদিন তুলতে আসতো না। ওর বাবা জীবিত থাকাকালে তিনি পেনশনের টাকা তুলতে পারেননি। এজি অফিসে শুধু আসা-যাওয়াই করেছেন। মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি অর্থের কষ্ট করে গেছেন। কর্মময় জীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি ভোগ করে যেতে পারেননি। এ রকম অনেকেরই হয়। প্রশাসনে অনেকের ফাইল নড়তেই চায় না। আবার অনেকের ফাইল দ্রুত গতিতে দৌড়ায়। জলির বাবা জামাল উদ্দিন তেমন কেউ ছিলেন না যে, তার ফাইলটা দৌড়াবে। তিনি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের একজন সামান্য কেরাণী ছিলেন। নিরীহ টাইপের লোক ছিলেন তিনি। তার অর্থ ছিল না, প্রভাব ছিল না, এমনকী সাহসও ছিল না। তার পেনশনের টাকা উঠবে কীভাবে? কেউ ফোন করে দিলে ফাইল ছুটবে, এমন কেউ ওদের নেই। ফলে জামাল উদ্দিন তার পেনশনের টাকা তুলতে পারেননি। ওর বাবার সর্বশেষ পোষ্টিং ছিল মুন্সিগঞ্জ শহরে। এখানে চাকুরি করেছেন প্রায় তিন বছর। চাকুরির শেষ সময়ে এসে তিনি এই শহরেই থিতু হয়ে বসার চেষ্টা করেছিলেন। মানিকপুরে একখন্ড জমি কিনে, সেই জমিতে দোচালা টিনের একটি ঘর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত একমাত্র মেয়েকে কোন সৎ পাত্রের হাতে তুলে দেবার স্বপ্নও দেখেছিলেন। তার স্বপ্নটা এক তাল বেদনা হয়ে জমে থাকতো মনে। জলিকে নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তা করার ওর বাবা এখন বেঁচে নেই। বাবাকে নিয়ে জলির চাপা কান্না আছে, আক্ষেপ নেই। আহাজারি বা হাহাকার নেই। জলির নিজেকে নিয়ে কোন দুঃশ্চিন্তা বা কষ্ট নেই। বাবার মৃত্যুও জলিকে বিচলিত করেনি। ওর নির্মোহ চোখের দিকে ভালো করে তাকালে যে কেউ নিলুপ্ত জীবনের স্বরলিপি খুঁজে পাবে। ওর বর্তমান নিয়ে কোন ভাবনা নেই। ভবিষ্যতের রূপরেখাও নেই। নিজেকে নিয়ে ওর নিজের কোন মায়া নেই। ওর চোখে যেমন জল নেই, ওর মনেও কোন কোলাহল নেই। অন্য যে কোন মেয়ে বা নারীর জীবনের সাথে ওর জীবনের কোনো মিল নেই। ও মিল খুঁজেও বেড়ায় না। ও জানে, একা চলার দুরন্ত সাহস ছাড়া ওর কিছুই নেই।

জীবন-মৃত এই জলি বশির আহমেদের সামনে বসে মেকী হাসি ধরে রেখেছে মুখে। অনেক দিন পর জলি আজ হাসছে। হোক তা মেকী হাসি। ও হাসতেই যেন ভুলে গিয়েছিল। ওর হাসিটা কেমন হলো কে জানে, তবে বশির আহমেদ নড়ে চড়ে বসলেন। এতোক্ষণ তিনি কেমন নির্লুপ্ত ভাব করে বসেছিলেন। তিনি যেন জলির কথা শুনতেই পারছিলেন না। কিংবা

শুনছিলেন না। একটা ফাইল টেনে নিজেকে ব্যস্ত রাখার ভান করছিলেন। ভাবটা এরকম যে, কন্যা হিসাবে বাবার পেনশনের টাকা তোলা এক অসম্ভব কাজ। জলি ও সব ভাব বুঝতে পারে। ওর ইচ্ছে করছিলো পায়ের ছেঁড়া স্যান্ডেল দিয়ে বশির আহমেদের গালে ঠাস ঠাস করে আঘাত করে ভড়কে দিতে। যে বেঁচে থেকেও মৃত, তার ভয় কী? একটা নোংরা পুরুষকে জুতো পেটা করতে পারলে মন্দ কী? অবশ্য সব পুরুষকেই জলির নোংরা মনে হয়। ওর মনে হয় পুরুষ হচ্ছে কুকুর শ্রেণীর। সব সময় লালসার জিহবাটা বের করে রাখে। বশির আহমেদকে জব্দ করতে জলি সহজ পথ ধরলো। তার ভেতরের কদর্য লোকটিকে জাগিয়ে তুলতে লাগলো ও। ওর হাসিটা মোক্ষম অস্ত্র হয়ে কাজে লাগলো। বশির আহমেদ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন ওর চোখের ভাষা পড়তে চাইছেন। জলি এবার হাতের ব্যাগটি ইচ্ছে করে ফ্লোরে ফেলে দিল। ব্যাগটি তুলে আনার সময় ওর শাড়ির আঁচলটি কাঁধ থেকে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়লো। জলি ওর শাড়ির আঁচল ঠিক করলো একটু সময় নিয়ে। আঁচলবিহীন ব্লাউজে আবদ্ধ জলির হৃষ্টপুষ্ট বুক মাত্র কয়েকটা মুহুর্ত ছিল বশির আহমেদের চোখের সামনে। ব্যাস, তার লালসার লম্বা জিহ্বাটা বেরিয়ে এলো। জলির এই মুহুর্তে বশির আহমেদকে জিহবা বের হওয়া কুকুরের মত লাগছে। ও নিজের ভেতরে জেগে ওঠা চাপ চাপ ঘৃণা চাপা দিয়ে ফের মিষ্টি করে হাসলো। বললো,

‘স্যার, আমার কেউ নেই। একা থাকি। অনেক কষ্টে আছি। বাবার পেনশনের টাকাটা তুলতে পারলে..।’

‘তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।’

বশির আহমেদ বিগলিত গলায় বললো। জলি বললো,

‘স্যার, আপনি খুব ভালো মানুষ।’

জলির কথায় বশির আহমেদ হাসলেন। তিনি গলা নামিয়ে বললেন,

‘কাজটা অতো সহজ নয়। কিন্তু আমি করে দেব। তবে আমাকে একটু খুশি করতে হবে।’

জলি দু’চোখে রহস্য ছড়িয়ে বললো,

‘কী রকম খুশি, স্যার?’

‘তেমন কিছু নয়। এই ধরো আমরা একটু কোথাও ঘুরতে গেলাম। ধরো..।”

‘ওহ্‌, বুঝেছি স্যার।”

‘সত্যি বুঝেছো?’

বশির আহমেদ নিশ্চিত হতে চান। আগুন নিয়ে খেলতে জলির ভয় কী? তবে একটু সাবধানে খেলতে হবে। ও বললো,

‘আপনি যা বলবেন, তাই হবে, স্যার। আগে বাবার পেনশনের টাকাটা যদি পাওয়ার ব্যবস্থা করতেন..।’

‘ও সব নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তুমি আগামী সপ্তাহে একবার আসো। আমি দেখছি, কী করা যায়।’

এ কথা বলার সময় বশির আহমেদের মুখ থেকে থু থু ছিটকে বেরিয়ে এলো। কামনায় উদ্দীপ্ত কুকুরের যে রকম হয়। জলি চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
'সত্যি, স্যার!'
'তিন সত্যি!'
এ কথা বলেই বশির আহমেদ জলির একটি হাত ধরলেন। নিঃসঙ্কোচে। যেন সব কথা হয়ে গেছে, এখন ওর হাত ধরার যায়। জলির ইচ্ছে করলো তার হাতটি তুলে কামড়ে দিতে। ও নিজেকে সংযত করলো। বশির আহমেদ জলির হাতটি নিজের দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন। জলি বাধা দিল না। পাপের স্পর্শ। জলি এই পাপটুকু মেনে নিলো। পাপ কিংবা পূন্য কোনটাই ওকে এখন স্পর্শ করেনা। ওর বোধ শক্তি যেন পাথর হয়ে গেছে। জলি কয়েকটা মুহূর্ত পর বশির আহমেদের মুঠিবন্দি থেকে নিজের হাত আলতোভাবে মুক্ত করে নিলো। ও বললো,
'আজ তাহলে আসি, স্যার? আগামী সপ্তাহে আসবো। টাকাটা পাবার ব্যবস্থা করে দেবেন, প্লিজ!'
'তুমি বলছিলে, তুমি একা থাকো?'
'জ্বি, স্যার।'
'ঠিক আছে, আমি তোমার থাকার ব্যবস্থাও করবো। তোমার ভার আমি নিচ্ছি।'
বশির আহমেদের চোখ জ্বলজ্বল করছে। জলি জানে, বশির আহমেদ শুধু ওর শরীরের ভারটুকুই নিতে চায়। জীবনের ভার নয়। ওর ভেতর থেকে মুখে এক দলা থুতু উঠে আসে। অন্য সময় হলে ও এক দলা থুতু 'ওয়াক থু!' বলে বশির আহমেদের মুখে ছুঁড়ে মারতো। গা রিনরিনে ঘৃণার চাপ সামলে নিয়ে ও বললো,
'কী রকম ব্যবস্থা করবেন?'
'এই ধরো, কোথাও তোমাকে বাসা ভাড়া করে রাখবো। মাঝেমাঝে আমি আসবো, এই আর কী?'
বশির আহমেদের কুতকুতে চোখ খুশিতে ডগমগ করছে। জলি তার কথার অর্থ বুঝতে পারছে। ও এ নিয়ে আর কোন কথা বাড়ালো না। আগে পেনশনের টাকাটা উঠে আসুক, পরে এর একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে, দ্রুত ভেবে নিল ও। মেকী হাসিটি ও টেনে ধরে রাখলো মুখে। জলি দেখলো বশির আহমেদ কত সহজেই ওর হাসির ছোরায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। ও মনে মনে বললো, 'লম্পট পুরুষরা কি এতো বোক হয়!'

৬

পুলক লোকটিকে চিনতে পারলো না। এই লোকটি জেলখানায় ওর সাথে কেনো দেখা করতে এসেছে, ও তা জানে না। পুলকের সাথে ঠান্ডু ছাড়া এ পর্যন্ত কেউ দেখা করতে আসেনি। আসার কথাও নয়। ওর বাবা-মা জেল তো দূরের কথা, জেলের বাইরেও ওর সাথে দেখা করতে আসবেন না। ও বাড়িতে গেলে তারা ওকে তাড়িয়ে দেন। নষ্ট ছেলের

মুখ দেখতে চান না তারা। ওর বাবা ভীষণ রাগী মানুষ। বাবা রাগ করবেন, এই কারণে মা ওর সাথে কথা বলেন না। বাড়িতে গেলে বসতেও বলেন না তিনি। এ নিয়ে মায়েরও অনেক কষ্ট। মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে ও। তাই পুলক খুব একটা বাড়িতে যায় না। বাবার ঘৃণা ও রাগ এবং মায়ের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দহন ও আর বাড়াতে চায় না। ছোট বোন শায়লার বিয়ে হয়ে গেছে। ও থাকে সিরাজদিখান। ও ছোট বোনের শশুড়বাড়িতেও কখনো যায় নি। শায়লার সাথে ওর অনেকদিন যাবত কোনো যোগাযোগ নেই। ওর সাথে দেখা করতে আসা লোকটি শায়লার শশুড় বাড়ির কেউ হবেন-এমন আশা করছে না পুলক। ও লোকটির দিকে ভালো করে তাকালো। লোকটির বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বছর হবে। পুলকের সমবয়সী। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। গায়ে পড়েছে গাঢ় সবুজ রঙের খদ্দেরের পাঞ্জাবী। এমন কালো লোক গাঢ় সবুজ রঙের পাঞ্জাবী কেন পড়েছে, কে জানে। এতে লোকটিকে আরো কালো দেখাচ্ছে। পরনে মলিন প্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল। তবে চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। লোকটির মাথা জুড়ে কোকড়ানো চুলের ঢেউ। গায়ের রঙ কালো হলেও লোকটির মুখের অবয়ব সুন্দর। কিন্তু দৃষ্টি সরল নয়। চোখের দিকে ভালো তাকালে লোকটিকে সুবিধার মনে হয় না। কিন্তু মুখের দিকে চট করে তাকালো লোকটিকে খুব নিরীহ ও বিনয়ী মনে হবে। পুলক লোকটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নিলো। ও লোকটির মুখের ওপর কৌতুহলের দৃষ্টি ধরে রেখে বললো,

‘আমি ঠিক, আপনাকে চিনতে পারছি না।’

এ কথায় লোকটি ভীষণ লজ্জা পেল। সে লজ্জিত কণ্ঠে বললো,

‘আমাকে আপনার চেনার কথা নয়।’

‘কে আপনি?’

‘জ্বে, আমার নাম নিহার গায়েন।’

‘আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন কেন?’

‘জ্বে, একটা জরুরি কাজ আছে। আপনার সাথে জরুরি কাজটি নিয়ে কথা বলতে এসেছি।’

পুলক বুঝতে পারছে লোকটি কোনো মতলবে এসেছে। এ ধরনের লোক অকারণে জেলখানায় কারো সাথে দেখা করতে আসে না। পুলক আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো নিহারের আপাদমস্তক। এরপর বললো,

‘আপনি কোথায় থাকেন? আমার সাথে আপনার কী এমন জরুরি কাজ?’

‘আমি এ শহরের কেউ নই। আমাকে আপনি চিনবেন না। তবে একটা ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। তাই, আপনার কাছে এসেছি।’

নিহারের মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। পুলকের বুঝতে পারছে লোকটির উদ্দেশ্য সরল নয়। মাস্তানদের কাছে সরল উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ আসে না। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই লোকজন আসে। পুলক সর্তক গলায় বললো,

‘তা জনাব, আপনার পেশা কি?’

এই প্রশ্নে নিহার আবার লজ্জা পেল। সে মাথা নিচু করে বললো,

‘জ্বি, আমি গায়েন। গান গাই। ছাত্র-ছাত্রী পেলে গানও শেখাই।’
নিহারের কথা শুনে কেমন থমকে গেল পুলক। একজন গায়েন এসেছে তার সাহায্য নিতে। বিষয়টি কেমন খটকা লাগার মতো। মাস্তানদের কাছে সাধারণত ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ বা সমস্যগ্রস্থ পেশাজীবীরা আসেন। জমি দখল-বেদখলের জন্যও অনেকে আসেন। কিন্তু গায়েন কোনো মাস্তানের স্মরণাপন্ন হয়েছে, এমন ও শুনেনি। পুলক ভীষণ অবাক হলো। ওর মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে ওঠলো। পুলক এক সময় গান গাইতো। ভালোই গাইতো সে। কণ্ঠশিল্পী হিসাবে কলেজে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুন্সিগঞ্জ শহরেও ওর নাম-ডাক ছিল। সে দু’তিন বছর আগের কথা। ও এখন আর গান গায় না। যে হাতে হারমোনিয়ামের বিটে সুর তুলতো, সে হাতের সঙ্গে এখন ছোরা বা আগ্নেয়াস্ত্রের সখ্যতা। এতোদিন পর এই গায়েন কী ওকে কোন জলসায় গান গাইবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে? এ কথা মনে হতেই পুলক কেমন বিব্রত হয়ে গেল। ও লজ্জিত কণ্ঠে বললো,
‘গায়েন সাহেব, আমি গান-বাজনা অনেকদিন হলো ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।’
পুলকের জবাবে নিহারও অবাক হলো। সে ফিক করে হেসে ফেললো। বললো,
‘আমি আসলে গান-বাজনার জন্য আপনার কাছে আসিনি। আপনি ভুল বুঝছেন।’
পুলক এবার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
‘গায়েন সাহেব, তবে আপনি আমার কাছে কী চান!’
‘সহযোগিতা।’
‘সহযোগিতা?’
‘হ্যাঁ, সহযোগিতা। আপনার সহযোগিতা পেলেই আমার একটা ভীষণ কাজ হাসিল হয়ে যাবে। অনেক দিন যাবত আমি কাজটি হাসিল করার জন্য ঘুরছি।’
‘কাজটা কি, শুনি। আমি কিন্তু সব কাজ করি না। মানে খুন-খারাবি করি না।’
‘ছিঃ ছিঃ! কী যে বলেন! আমি শিল্পী মানুষ, খুন-খারবি কী করাইতে পারি?’
নিহার কঁকিয়ে ওঠে। পুলক বলে,
‘ঠিক আছে, কী করতে হবে বলুন। তবে জেল থেকে কবে বের হতে পারবো, বলতে পারছি না। আপনার কাজটা জরুরি হলে অন্য কারো কাছে যান।’
‘না, না। আপনি ছাড়া এই কাজটা কেউ করতে পারবে না।’
‘তাই নাকি! তা কাজটা কী?’
‘তা বলছি। শুনলাম, আপনি নাকি জলির ওপর খুব খেপেছেন?’
এ কথায় ফের অবাক হলো পুলক। পুলকের এমন ব্যক্তিগত রাগের কথা নিহার জানলো কী করে? নিশ্চয়ই, ঠান্ডুর কাছ থেকে জানতে পেরেছে। ঠান্ডু পেটে যে কথা ধরে রাখতে পারেনা, তা ও জানে। ওর অনেকগুলো দোষের মধ্যে এটিও একটি। এই মুহূর্তে ঠান্ডুর প্রতি ভীষণ রাগ হলো পুলকের। ও রাগ সামলে নিয়ে নিহারের উদ্দেশ্যে বললো,
‘আপনি কি জলির জন্য কথা বলতে এসেছেন?
নিহার এর উত্তর না দিয়ে বললো,

'আমি জানতে পেরেছি, আপনি জলির উপর খুব রেগে আছেন। আপনি জেল থেকে ছাড়া পেলে ওর একটা কিছু করবেন, তাই না?'
পুলক রাগী গলায় বললো,
'একটা কিছু নয়, আমি ওকে খুন করবো!'
'আমি জানি, আপনি ওর প্রতি খুব রেগে আছেন। আমিও ওকে দেখে নিতে চাই।'
'তো?'
'না, বলতে চাচ্ছি, আপনার আমার দু'জনেরই টার্গেট হচ্ছে জলি।'
'আপনি কী বলতে চান?'
'আমি বলতে চাই, জলিকে আপনি আমার হাতে তুলে দেন।'
'শাট-আপ!'
চিৎকার করে উঠলো পুলক। এতে ভড়কে গেল নিহার। ও কাচুমাচু করে বললো,
'আহা! আমি তো জলিকে নিয়ে অভিসারে যাচ্ছি না! ওর সাথে আমার অনেক লেনদেন আছে। আমি ওকে পুড়িয়ে মারবো। ওকে জ্যান্ত কবর দেব!'
'তা আমার কাছে এসেছেন কেন? আপনি নিজে ওকে কবর দিতে পারেন না?'
'আমার অতোটা সাহস নেই। এ সব কাজে আপনাদের মত লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।'
'কিন্তু?'
'ঐ যে বললাম। ও আমাদের দু'জনারই শত্রু। তাই দু'জনে হাত মেলাতে পারি।'
'কিন্তু আমি ওকে আপনার হাতে তুলে দেব কেন?'
'আপনি নিজের হাতে ওকে খুন করে লাভ কী বলুন? তারচেয়ে আমার হাতে তুলে দিলে আমারও কাজ হলো, আপনার শত্রুও খতম হলো।'
'নিহার সাহেব, একটা মেয়েমানুষকে খতম করতে দু'জন পুরুষকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে কেন? এটা এক ধরনের কাপুরুষতা! আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান।'
পুলকের রাগকে গায়ে না মেখে নিহার নরোম গলায় বললো,
'আপনি জানেন না, জলি কতটা জেদী আর সাহসী! ও কাউকে ভয় পায় না।'
'নিহার সাহেব, আমি ওকে ভয় দেখাতে চাই না। আমি ওর প্রাপ্যটুকু ফিরিয়ে দিতে চাই। আপনি এখন যান। এ নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না।'
'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তবে আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবেন। নিজের হাতে রক্ত না মেখে, ওকে তুলে দিতে পারেন আমার হাতে। ওকে হাতের নাগালে একবার পেলে আমি ওকে ভেঙে চূড়মার করে দেবো!'
পুলক নিহারের কথা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে রইলো। ও আর কথা বাড়াতে চায় না। নিহার 'আচ্ছা, আসি' বলে বিদায় নিল। নিহার জলিকে কেনো অপহরণ করতে চায় তা জানার কৌতুহল তৈরি হলেও পুলক কোনো প্রশ্ন করলো না তাকে। নিহারকে ওর সুবিধার লোক বলে মনে হয়নি। লোকটিকে দেখে নিরীহ মনে হলেও ভেতরে সে ভীষণ

হিংস্র একজন মানুষ। তার প্রস্তাব ওর একেবারেই ভালো লাগেনি। পুলক ওর ব্যক্তিগত রাগ শেয়ার করতে চায় না কারো সাথে। নিহারকে ফিরিয়ে দিয়ে ও ভালোই করেছে। নিজের কাজ ও নিজে একাই করবে।

৭

বশির আহমেদ জলির হাত দু'টো নিজের হাতে তুলে নিলেন। জলি বাধা দিল না। ও বসে আছে বশির আহমেদের টেবিলের সামনে। জলি লক্ষ্য করলো বশির আহমেদের একটি পা টেবিলের নিচে নড়াচড়া করছে এবং খুব দ্রুত তার পা'টি জলির পায়ে ঘষতে লাগলো। আলতোভাবে। জলির গা শিউরে উঠলো। পুরুষ মানুষ চট করে এতো কুৎসিত কীভাবে হয়? জলি মুখে মেকী হাসিটা ধরেই রাখে। নোংরা এই অত্যাচার ওকে সহ্য করতে হবে। নইলে বাবার পেনশনের টাকা আর পাওয়া যাবে না। বশির আহমেদ জলির পায়ে পা ঘষে যাচ্ছে। তার দু' চোখে গভীর মাদকতা। জলি বললো,

'আজ চেকটা পাবো, সত্যি!'

এ কথায় দু'চোখের তাড়া নাচিয়ে বশির আহমেদ হাসলেন। গলা নামিয়ে বললেন,

'তোমার জন্য আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। ফাইল কী সহজে নড়ে? আমি নিজে ফাইলের পিছু পিছু ছুটেছি।'

'সত্যি!'

'নয়তো কী? এতো সহজেই চেক পেতে?'

'আপনার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।'

এ কথায় কেমন চোখে তাকিয়ে হাসলেন বশির আহমেদ। বললেন,

'কিছুটা ঋণ যে তোমাকে শোধ করতেই হবে!'

'কী করতে হবে, বলুন।'

'ঐ যে বলছিলাম। একটু ঘুরবো, ফুর্তি করবো, এই আর কী।'

'হ্যাঁ, আর বলছিলেন আমার ভার নেবেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা-ও বলেছিলাম।'

'কবে ঘুরতে নিয়ে যাবেন, বলুন। আমি রাজী।'

এ কথায় বশির আহমেদের পায়ের ঘষাঘষিটা যেন বেড়ে যায়। তার পা-টা বেপরোয়া হয়ে যেতে চেষ্টা করে। জলি নিজের পা দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জলির খুব ইচ্ছা করছে বশির আহমেদের পা হাতুরি দিয়ে থেতলে দিতে। এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিতে তার মুখে। ও সামলে নেয় নিজেকে। বশির আহমেদ বললেন,

'চলো, আশেপাশের কোনো হোটেলে গিয়ে একটু রেষ্ট নিয়ে আসি। তারপর চেকটা নিয়ে যেও।'

জলি আবারো মেকী হাসিটা ঝুলিয়ে নিলো মুখে। লজ্জিতভাব প্রকাশ করে বললো,

‘আপনে যে কী! বললেই কী যখন তখন সব কিছু পাওয়া যায়? মেয়েদের কিছু সময় থাকে না?’
এ কথায় বশির আহমেদের পা থেমে গেল। তিনি বোকার দৃষ্টি মেলে বললেন,
‘ঠিক বুঝলাম না। কী বলতে চাইছো।’
জলি এবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বশির আহমেদকে বোকা বানাতে পেরে ওর ভালোই লাগছে। ও বললো,
‘আমি শারীরিকভাবে সুস্থ কিনা, এটা আগে জানবেন না? শুধু হোটেলে গেলেই হবে?’
এ কথায় বশির আহমেদ খুব লজ্জা পেলেন। তিনি বললেন,
‘সরি, ও কথা আমার মাথায় আসেনি। তা আজ তুমি অসুস্থ?’
‘জ্বি।’
‘সুস্থ হবে কবে?’
‘পরশু।’
‘পরশু তো শুক্রবার। অফিস বন্ধ।’
‘তাতে কি হয়েছে? আমাকে চেকটা দিয়ে দিন। শুক্রবার না হয় সারাদিন আপনার সাথে থাকবো।’
‘না, মানে..।’
‘বাহ্ রে, আমাকে আপনি বিশ্বাস করছেন না!’
‘না, না, তা নয়। বলছিলাম কি, চেকটা শনিবার নিলে হয় না?’
এবার জলি নিজের পা রাখে বশির আহমেদের পায়ের উপর। সুযোগটা ও হাতছাড়া করতে চায় না। জলির পায়ের স্পর্শে বশির আহমেদ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জলি বললো,
‘চেকটা আমার আজই দরকার। কথা তো হয়েই গেল, শুক্রবার আসবো। আপনি আমার যে উপকার করেছেন, আপনাকে আমি ঠকাবো না।’
বশির আহমেদ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কয়েকবার চোখ রাখলেন জলির চোখে। কী যেন পড়ার চেষ্টা করছেন। এরপর বললেন,
‘ঠিক আছে। চেক নিয়ে যাও। শুক্রবার আমার শুশ্বড়বাড়িতে নেমতন্ন আছে। এখন ঐ দাওয়াতে যাওয়া যাবে না।’
‘ওহ্! আপনার খুব অসুবিধা হয়ে গেল, না?’
জলি দুঃখ প্রকাশ করে। এর জবাবে বশির আহমেদ বলেন,
‘অসুবিধা আর কি, বউয়ের সাথে মিথ্যা কথা বলতে হবে। বড় স্যারের একটা কাজ দেখিয়ে দেব। সে যাগগে,
তাহলে তুমি শুক্রবার কোথায় আসবে?’
‘আপনিই বলুন, কোথায় আসবো?’
‘শুক্রবার সকাল এগারটায় তুমি আসবে তোপখানা রোডের হোটেল মৃগয়াতে। রুম নম্বর ২২০ এ আমি থাকবো। সোজা চলে আসবে রুমে, বুঝলে?’

‘জ্বি, বুঝেছি।’
‘কোনো সমস্যা হলে আমার মোবাইলে ফোন করবে।’
‘আচ্ছা।’
বশির আহমেদ অফিসের আলমারি খুলে একটি চেক বের করলেন। চেকটি রাখলেন টেবিলের উপর। কাগজ তৈরিই ছিল। বশির আহমেদের বাড়িয়ে দেয়া কাগজে স্বাক্ষর করলো জলি। চেকটি নিয়ে ব্যানিটি ব্যাগে ভরে ফেললো। ধীরে ধীরেই তা করলো ও। বশির আহমেদ একটু চিন্তিত। জলি ফের মেকী হাসিটা বিলিয়ে দিল। জবাবে বশির আহমেদও হাসলেন। জলি মনে মনে বললো, ‘পিচাস কোথাকার!’

শুক্রবার বেলা এগারটায় জলি ফোন করলো বশির আহমেদের বাসার নম্বরে। দু’ বার রিং বাজতেই ও প্রান্ত থেকে একজন মহিলার কণ্ঠ ভেসে এলো,
‘হ্যালো।’
‘হ্যালো, কে বলছেন?’
জানতে চাইলো জলি। মহিলা পাল্টা প্রশ্ন করলো,
‘আপনি কে? কাকে চাচ্ছেন?’
‘আমি জলি।’
‘কাকে চাচ্ছেন?’
‘আমি বশির সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।’
‘আমিই উনার স্ত্রী। বলুন।’
‘আপনি কী জানেন, উনি এখন কোথায় আছেন?’
‘উনি অফিসের কাজে একটু বাইরে গেছেন। কেনো বলুন তো?’
মহিলার কণ্ঠস্বরে বিরুক্তি। জলি বললো,
‘উনি অফিসের কাজে নয়, একজন মহিলাকে নিয়ে ফূর্তি করতে একটি হোটেলের রুমে অপেক্ষা করছেন।’
ও প্রান্ত থেকে কিছুক্ষণ কোন শব্দ শোনা গেল না। জলি লাইন ধরে আছে। ও জানে, বশির আহমেদের স্ত্রী কথা বলবেন। স্ত্রীরা স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলে কৌতুহলী হয়ে উঠে। বশির আহমেদের স্ত্রী একটুপর ভারি গলায় বললেন,
‘আমি আপনার কথা কেনো বিশ্বাস করবো? আপনার পরিচয়টা দিন তো!’
এ কথায় জলি ছোট্ট করে হাসলো। ও বললো,
‘আমার তেমন কোনো পরিচয় নেই। আপনার স্বামী হোটেলের রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।’
‘কী বললেন!’
‘হ্যাঁ। উনি এখন আছেন তোপখানা রোডের হোটেল মৃগয়াতে। রুম নম্বর ২২০-এ। আমার কথা আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি এখন ওখানে যেতে পারেন।’

'আপনার কথা বিশ্বাস করতে যাবো কেনো?'
'বিশ্বাস করবেন কি, করবেন না, সেটা আপনার ব্যাপার। তবে একটু সূত্র দিচ্ছি। আজ আপনার বাবার বাড়িতে দাওয়াত আছে, তাইনা?'
'হ্যাঁ।'
'বশির সাহেব আপনাকে বলেছেন, অফিসের বড় কর্মকর্তার সঙ্গে তার জরুরি কাজ আছে, তাইনা?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'
'এবার বুঝতে পারছেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি না?'
'কিন্তু, আপনি আমাকে এ কথা বলে দিলেন কেনো?'
'কারণ, আমি চাই, আপনি আপনার স্বামীকে ভালো করে চিনে নিন। তাকে চোখে চোখে রাখুন। আপনার স্বামী কদর্য শ্রেণীর লম্পট পুরুষ!'
এ পর্যন্ত বলেই জলি লাইনটা কেটে দিল। এর বেশি আর কথা বলার প্রয়োজন নেই। বশির আহমেদকে শায়েস্তা করার এরচেয়ে ভালো পথ ওর জানা নেই। অনেক লোক ঘরে ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে থেকে বাইরে লাম্পট্য করে বেড়ায়। বশির আহমেদ সে ধরনের লোক। এবার স্ত্রীর সামনে তার মুখোশটা খুলে পড়ুক।

৮
'একা' নামটি শুনে ভীষণ চমকে গেল পুলক। কারারক্ষী বাতেন এসে ওকে জানালো যে, একা নামের একজন মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একার নাম শুনে ও চমকে উঠলো। একার নাম শুনলে রাগে ওর গা রি রি করে উঠার কথা। কিন্তু রাগটা তেমন ও টের পাচ্ছে না। জেলখানায় ওকে একা দেখতে এসেছে বলেই হয়তো ওর রাগটা জ্বলে উঠছে না। এটাও এক ধরনের দুর্বলতার প্রকাশ। কিন্তু এমন হবার কথা নয়। নিজের এই পরিবর্তনকে খতিয়ে দেখতে হবে বলে ভেবে নেয় পুলক। পুলকের আজকের যে 'মাস্তান' হিসাবে পরিচয় গড়ে উঠেছে কিংবা ও যে পঙ্কিল পথে হারিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য দায়ী ঐ 'একা' মেয়েটি। একার জন্যই ও আজ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মাস্তানীতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে। বিপদগামী হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। একা এবং একার পরিবারই ওকে ঠেলে দিয়েছে অবক্ষয়ের চোরবালিতে। আজ তিন বছর পর একা কোনো এসেছে ওর সঙ্গে দেখা করতে? জেলখানাতেই বা কেনো এসেছে? পুলকের বিস্ময়ের রেশ কাটে না। ও একার সঙ্গে দেখা করবে কিনা ভাবতে লাগলো। কি হবে একার সঙ্গে দেখা করে? যে মেয়েটি ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, সে তিন বছর পর এখন কী বলতে চায়? জবাব না জানা এই প্রশ্নটার সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে পুলক হারিয়ে গেল নিকট অতীতে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তিন বছর আগের কিছু স্মৃতি।
একা ছিল ওর ছাত্রী। পুলক তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। অনার্স ফাইনাল ইয়ারের সময় ও একাকে পড়ানোর টিউশনিটা পায়। বইপাড়া হিসাবে পরিচিত বাংলাবাজারে একাদের

পুরানো আমলের বিশাল বাড়ি। একার বাবার নবাবপুরে মোটর পার্টস এবং ইলেক্ট্রনিক্স মালামালের রমরমা ব্যবসা। ক্লাসম্যাট ইশতিয়াক ওকে এই টিউশুনিটা জুটিয়ে দিয়েছিল। একাকে পড়ানো যে কোনো শিক্ষকেরই গলদগর্ম হবার কথা। পুলকের হতো। কিন্তু মোটা অংকের বেতনটার কথা মাথায় রেখে ও একাকে পড়িয়ে যাচ্ছিলো। আসলে একা কখনোই লেখাপড়া পছন্দ করতো না। পড়তোও না। ও শুধু সিনেমা দেখতো। হিন্দি ফিল্মের সব নায়ক-নায়িকা, এমনকী পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতার নামও ও বলে দিতে পারতো। হিন্দি বা বাংলা কোনো ছবি ও বাদ দিতো না। বাড়িতে প্রতিদিন ভিসিআরে এবং প্রতি সপ্তাহে সিনেমা হলে গিয়ে ও ছবি দেখতো। ধনী ব্যবসায়ী বাবার আদরের মেয়ে হিসাবে ও বড় হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত স্নেহে। মেট্রিক পাশ করেছে তৃতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে। তা ও টেনে-টুনে কোনো রকমে পাশ হয়েছে। এতেই ওর বাবা-মা ভীষণ খুশি। তারা মেয়েকে নিয়ে আহলাদে আটখানা। ওর বাবা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু তিনি ঝানু ব্যবসায়ী। মা নিরক্ষর। তিনিও সারাক্ষণ সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বাড়িতে চারটি কাজের লোক। এই বাড়িতে নিয়মিত ভূড়িভোজ লেগেই থাকে। একা ওর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। একাকে পড়াতে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যেত পুলক। একা মাঝেমাঝে অদ্ভূত আচরণ করতো। পুলক লক্ষ্য করতো একা মাঝেমাঝে ওর পা রেখে দিত পুলকের পায়ের উপর। পুলক পা সরিয়ে নিলেও একা পা বাড়িয়ে দিতো ওর পায়ের দিকে। কিন্তু ‘মুখে কিছুই হয়নি’ ভাব ফুটিয়ে রাখতো। পুলক বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে ওকে এই জন্য বকা দিতো। পুলক বকা দিলেই একা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলতো। ওর কান্না শুনে ছুটে আসতো ওর মা। পুলককে রাগী গলায় ঢাকাইয়া ভাষায় বলতো,

‘মাষ্টার সাব, আমার মাইয়ার কী হইছে। বকা দিছেন নাকি? বকা দিছেন কেল্লাই?’

বকা দেবার কারণ একার মাকে পুলক বলতে পারতো না। ও জানতো সত্যি কথা বললেও একাকে ওর বাবা-মা কিছু বলবে না। কিন্তু পুলকের চাকরিটা যাবে। তাই ও চুপসে যেত। ওর মধ্যেও একাকে লেখাপড়ায় মনযোগী ছাত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে জেদ কাজ করতো। পুলকের মনে হতো একার দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে দিতে পারলেই মেয়েটির ‘পাগলামী’ বন্ধ হয়ে যাবে। পুলক আন্তরিকভাবে সে চেষ্টাই করতো। কিন্তু আট মাসের মধ্যে ও পড়ে গেল একার পাতানো ফাঁদে। এই ফাঁদটি একা তৈরি করেছিল সিনেম্যাটিক কনসেপ্টে। পুলক তখন মাষ্টার্সের ছাত্র। অনার্সে সেকেন্ড ক্লাশ পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল না পুলক। তাই ও মাষ্টার্সে সিরিয়াস হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় খুব একটা যেত না। ক্লাস, কলেজের চত্বর, লাইব্রেরী আর হল-এই পরিধিতেই নিজেকে আটকে রেখেছিল পুলক। শুধু বিকেলে টিউশুনী করতে যেত। প্রতিদিনের মতো সেদিনও পুলক একাকে পড়াতে গেল। একা সেদিন একটি ব্যাগ হাতে উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের বাড়ির গেটের সামনে। পুলককে দেখেই বললো,

‘স্যার, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।’

‘আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছো, কেনো!’

‘সেটা বলছি। আগে বেবীটেক্সীতে উঠেন।’

বেবীটেক্সী থামানো ছিল ওর সামনে। একা বেবীটেক্সীটে চড়ে বসলো। এরপর পুলকের দিকে তাকিয়ে বললো,

‘তাড়িতাড়ি বেবীটেক্সীতে উঠেন!’

বিস্ময় প্রকাশ করে পুলক বললো,

‘বেবীটেক্সীতে কেনো উঠবো! কোথায় যাবে?’

‘আগে উঠেন তো, পরে বলছি।’

পুলক অস্বস্থি নিয়ে বেবীটেক্সীতে উঠলো। একা বেবীটেক্সীওয়ালার উদ্দেশ্যে বললো,

‘ফকিরাপুল যান।’

‘পুলকের অস্বস্থি বাড়তে থাকে। ও উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলো,

‘আমারা কোথায় যাচ্ছি? কিছুই তো বললে না! এখন বলো।’

‘স্যার, আমরা চিটাগাং যাচ্ছি।’

‘হোয়াট! চিটাগাং!’

‘জ্বি, স্যার।’

‘কেনো?’

‘আপনে গাবড়াচ্ছেন কেন? এতো ডরান কেন?’

‘তুমি এ সব কী বলছো? আমি চিটাগাং যাবো কেনো?’

এ প্রশ্নে একা পুলকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। ও বললো,

‘স্যার, আমার মা আজ রাগ করো চিটিগাং চলে গেছেন। ফুপুর বাড়িতে। আমি যাচ্ছি তাকে আনতে। আমি একা মেয়ে মানুষ কেমনে যাই? তাই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। চিটাগাং যাবো আর আসবো।’

‘তাই বলে এভাবেই কী চলে যাওয়া যায়? তা ছাড়া আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো, এটা কী ঠিক হচ্ছে? সবাই কী ভাববে?’

এবার মুচকি হাসলো একা। ও বললো,

‘সবাই আপবাদ দিলে আমারে নাহয় বিয়ে করে ফেলবেন।’

‘শাট-আপ! এ ধরনের ফাজলামী আমি পছন্দ করিনা। মনে রেখো, তুমি আমার ছাত্রী।’

‘সরি, স্যার। এমন কথা আর বলবো না।’

একা চট্টগ্রাম যাওয়া পর্যন্ত সত্যিই আর কোনো কথা বলেনি। ধনীর আদরের কন্যা এই প্রথম ধমক হজম করে চুপসে গেল।

ফকিরাপুল থেকে ওরা টিকেট কেটে বিলাসবহুল বাসে চড়ে বসলো। পাঁচ ঘন্টা পর বাস চট্টগ্রামে পৌঁছালো। এই দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা একা পুলকের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। পুলকও কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওর মনে অস্বস্থি ছড়িয়ে ছিল। বাস পাহাড়তলীত এসে শেষ স্টপিজে থামলো যখন, তখন রাত সাড়ে এগারটা। বাস থেকে নেমেই পুলক জানতে চাইলো,

‘তোমার ফুপুর বাড়ি কোথায়?’

একা ছোট্ট করে বললো,
'জানি না।'
এ টুকু জবাবেই ভূমিকম্প শুরু হলো যেন পুলকের বোধশক্তিতে। ও একার মুখের দিকে তাকালো। একার চোখে মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। পুলক ফের বললো,
'তুমি না বলেছিলে, তোমার মা এসেছে ফুপুর বাড়িতে? সেই ফুপুর বাড়িটা কোথায়?'
'এখানে আমার কোনো ফুপুর বাড়ি নেই।'
একার জবাবে হতভম্ব হয়ে গেল পুলক। একা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পুলক ওর খুব কাছে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,
'একা, তুমি এসব কী বলছো! তোমার মাথা কী ঠিক আছে!'
'না, আমি সত্যি কথাই বলছি, স্যার।'
'কোন কথাটি সত্যি? আমাকে আবার বলো। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!'
'এখানে আমার মা আসেনি। এখানে আমার কোনো ফুপুর বাড়িও নেই।'
'এ সব কী বলছো! তাহলে তুমি কেনো এসেছো!'
'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, স্যার!'
'পালিয়ে এসেছো, কেনো!'
'কোনো বুঝতে পারছেন না? আপনে 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত তক্' দেখেন নাই?'
'তুমি এ সব কী বলছো!'
'কেনো স্যার, আমাকে আপনি বিয়ে করতে পারেন না?'
'বিয়ে! তোমাকে! কোনো!'
পুলকের কণ্ঠে বিস্ময় আর বেদনা আহত পাখির মত ডানা ঝাপটাতে থাকে। একা একটু সময় নিয়ে বলে,
'স্যার, আমি অনেকদিন চিন্তা করেই আপনাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। যা হবার হয়েছে, আমি আর বাড়ি ফিরে যাবো না।'
'অসম্ভব!'
'কী?'
'তোমাকে বিয়ে করা।'
'কোনো?'
'এর উত্তর জেনে কী হবে? তুমি একবারও ভাবলে না, আমার মতামতটা কী হতে পারে! তোমার মনে ইচ্ছে হলো, আর এমনি মিথ্যা কথা বলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এলে? ছিঃ!'
এবার একা কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু একার এই কান্নার কোনো মূল্য নেই পুলকের কাছে। ওরা কথা বলছিল বাস স্টপিজের কাউন্টারের সামনে। কাউন্টারে ঢাকা গামী যাত্রীদের ভিড়। রাতের বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে যাবে। যাত্রীদের অনেকে পুলক এবং একাকে কৌতুহলী চোখে দেখছিল। ওদের কথা শুনতে না পেলেও ওদের মুখের অভিব্যক্তি যেন পড়ে নিতে চাইছিল কেউ কেউ। পুলকের ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত

নিলো এখান থেকেই ঢাকায় ফিরে যাবে। যেভাবেই হোক। ও একাকে নরোম গলায় বললো,
'যা হবার হয়েছে। চলো ফিরতি টিকেট কেটে ঢাকায় ফিরে যাই। এখান থেকেই।'
অশ্রুভেজা চোখে পুলকের দিকে তাকালো একা। বললো,
'স্যার, আমি কি খুবই খারাপ মেয়ে? আমাকে বিয়ে করলে আপনি কি বেশি ঠকে যাবেন?'
'ঠিক তা নয়, একা। প্রথমত তুমি আমার ছাত্রী। আমি তোমাকে কখনো ও চোখে দেখেনি।'
'কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসি, স্যার!'
'ওহ্! তুমি বুঝতে পারছো না! শোনো, আমি এখনো ছাত্র। আমার পরিবারের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কবে মাষ্টার্স পাশ করবো আর কবে চাকরি পাবো-এর কোনো ঠিক নেই। তোমাকে বিয়ে করলে আমি খাওয়াবো কি?'
পুলকের এই প্রশ্নে যেন খুশি হলো একা। ও উৎসাহ প্রকাশ করে হাতের ব্যাগটি দেখিয়ে বললো,
'ভয় নেই। আমি অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি! এখানে দশ লাখ টাকা আছে!'
এ কথায় আরো ভড়কে গেল পুলক। এতোটা দুঃসাহসী কোনো মেয়ে হতে পারে? হয়তো কেউ কেউ হয়। পুলক নিচু গলায় বললো,
'ঠিক আছে, আগে চলো ঢাকায় ফিরে যাই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তবে এভাবে পালিয়ে নয়। তোমার বাবার অর্থও আনতে হবে না।'
'কিন্তু, বাড়ি ফিরে গেলে আপনি আর আমাকে পাবেন না। আমি জানি, আমার বাবা আপনাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তিনি খুবই ডেঞ্জারাস লোক!'
'আমার যা হবার হবে। এখন চলো ঢাকায় ফিরে যাই। লক্ষ্মী মেয়ে!'
একা ঢাকায় ফিরে যেতে আপত্তি জানাতে লাগলো। কিন্তু পুলক নাছোরবান্দা। ও এগিয়ে গেল টিকেট কাউন্টারের দিকে। একা নড়লো না। পুলক টিকেট কেটে এনে বললো,
'যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসো, তবে ফিরে চলো।'
'কিন্তু স্যার, এতে আপনার বিপদ হতে পারে!'
'হলে, হবে। তবুও ঢাকায় ফিরতে চাই। চলো।'
এ কথা বলে পুলক বাসের দিকে এগিয়ে গেল। হতাশা আর স্বপ্ন ভাঙা বেদনা নিয়ে পুলককে অনুসরণ করলো একা।

ভোর বেলা ওরা ঢাকায় ফিরলো। পুলক একাকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়াটাকে দায়িত্ব বলেই মনে করলো। ও একাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। একাদের বাড়িতে প্রবেশ করেই পুলক বুঝতে পারলো ওর বাবা-মা সারারাত কেউ ঘুমাননি। সেটাই স্বাভাবিক। বাড়ি থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে মা-বাবার চোখে ঘুম আসার কথা নয়। একাদের বাড়িতে কেমন একটা থমথমে ভাব। ভোরের নির্মল পবিত্রতাকে স্পর্শ করেই যেন পুলক করাঘাত করলো একাদের বাড়ির দরোজায়। দরোজা খুললেন একার বাবা। তার পেছনে

ওর মা। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়ের ঢেউ। একা তাদের কোনো কিছু না বলে হন হন করে দরোজা দিয়ে ঢুকে গেল। একাকে ওর বাব বা মা কিছুই বললেন না। 'কিছুই হয়নি' এমন একটা ভাব তাদের মুখে ফুটে উঠলো। পুলক ইতস্তত করতে লাগলো। ওর কিছু একটা বলা দরকার। ঘটনাটা খুলে বলতে হবে। কামাল উদ্দিন পুলকের উদ্দেশ্যে শান্ত গলায় বললেন,

'আপনি ভেতরে আসুন।'

একার বাবা দরোজা থেকে আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলক তাদের ড্রয়ং রুমে প্রবেশ করলো।

ও ড্রয়ং রুমে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এরপর বসলো সোফায়। একা'র মা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। কামাল উদ্দিন বসলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। পুলক তার উদ্দেশ্যে বললো,

'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। পুরো ঘটনাটা আপনাকে খুলে বলতে চাই।'

কামাল উদ্দিন ঠান্ডা চোখে তাকালেন পুলকের দিকে। বললেন,

'মাষ্টার সাহেব, আপনি বসেন। আমি আসতাছি। আপনার সব কথা শুনবো।'

এই বলে কামাল উদ্দিন ভেতরের রুমের দিকে চলে গেলেন। পুলক অস্বস্থি নিয়ে একাদের ড্রয়ং রুমে বসে রইলো। ও অপেক্ষা করতে লাগলো কামাল উদ্দিনের জন্য। তাকে আসল ঘটনা খুলে বলে ও চলে যাবে। দীর্ঘ সময়ের ভ্রমণের ক্লান্তিতে পুলকের শরীর অবসণ্ন। ও অবসাদ নিয়ে একার বাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় আধা ঘন্টা পর কামাল উদ্দিন ড্রয়ং রুমে ফিরে এলেন। তার পেছনে এলো পুলিশের একটি দল। কোতায়ালি থানার ওসি আকবর হোসেন এগিয়ে এলেন পুলকের সামনে। পুলক পুলিশ দেখে হতবাক। কামাল উদ্দিন পুলককে দেখিয়ে ওসি'র উদ্দেশ্যে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

'এই হারামজাদাকে লইয়া যান! ও আমার মাইয়া কিডন্যাপ করছিল। ওরে কিডন্যাপ কেইসে এরেষ্ট করেন!'

পুলক খুব দ্রুত বুঝে নিলো ওর ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। ওর মনটা এতোই ভেঙ্গে গেল যে, ও টু শব্দও করলো না। ওসি সাহেব 'ভয়াবহ এক ক্রিমিনাল ধরছেন' এমন ভাব করে পুলকের শার্টের কলার চেপে ধরে চেয়ার থেকে ওকে টেনে তুললেন। পুলকের হাতে হাতকড়া লাগাতে লাগাতে একার বাবার উদ্দেশ্যে ওসি বললেন,

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। শুয়োরের বাচ্চাকে একেবারে সাত বছরের জেল খাটিয়ে ছাড়বো!'

পুলককে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। সে থেকেই পুলকের নষ্ট জীবনের শুরু। ওর নষ্ট হবার কষ্টের কথা কেউ জানে না। পুলক এ সব কথা কাউকে বলতেও চায় না।

জেলখানাটা বড় অদ্ভূত জায়গা। এখানে এলে কেউ আর সহজ পথে চলতে পারে না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সমাজের বাঁকা পথটা বেছে নেয় অনেকে। জেলখানা নষ্ট হবার এক আদর্শ স্থান। এই জেলখানাই বদলে দিয়েছে পুলকের জীবন। এক সময়ের মেধাবী ছাত্র এবং

কণ্ঠশিল্পী পুলক এখন মাস্তান। জেলখানা থেকেই তো এই জীবনের শুরু। আর এর জন্য দায়ী একা। সেই একাই আজ এসেছে ওর সঙ্গে দেখা করতে। আশ্চর্য!
'এমনভাবে চুপ মাইরা গেলেন কেনো? যান মেয়েটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। দেখা দিয়া আসেন।'
কারারক্ষী বাতেনের কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে পুলকের। ও ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
'মিয়া সাহেব, মেয়েটিকে গিয়ে বলেন যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। সে যেন আর কখনো না আসে।'
'কেনো?'
'যা বললাম, তা মেয়েটিকে বলে আসুন। প্রশ্ন করবেন না।'
কারারক্ষী বাতেন খানিকটা অবাক হয়ে চলে গেল জেলগেটের দিকে। পুলক স্মৃতি হাতরে ডুবে যেতে লাগলো নষ্ট হবার মিহিন কষ্টে।

৯
উকিলরা কি টাকার ভুভূক্ষ প্রাণী? প্রশ্নটি জলির মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে। ও বসে আছে শহরের সবচেয়ে বয়স্ক একজন উকিলের সামনে। এই উকিলের নাম বিমল রায়। তিনি ক্রিমিনাল মামলার একজন নামকরা উকিল। তিনি মামলা নিয়ে আদালতে দাঁড়ালে দাগী আসামীরও জমিন মঞ্জুর হয়ে যায়। আর বাদী পক্ষের জন্য দাঁড়ালে আসামী ছিঁচকে চোর হলেও তার জামিন হয় না। বিমল রায়কে নিয়ে এ ধরনের গল্প চালু আছে আদালত পাড়ায়। জলি খোঁজ-খবর নিয়েই তার কাছে এসেছে। জলি জানে, ভালো একজন উকিল ধরলে পুলককে জেল থেকে বের করা যাবে। পুলককে জেল থেকে বের করার দায়বোধ ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নইলে পুলক কেন, সকল পুরুষগুলোই যদি জেলে থাকতো, ওর চেয়ে আর কেউ বেশি খুশি হতো না। ওর হাতে কোনো মন্ত্রবল থাকলে ও সকল পুরুষকেই জেলখানায় বন্দি করে রাখতো। মাঝেমাঝে জেলখানায় হিংস্র কুকুর ছেড়ে দিতো বা উপর থেকে গরম পানি ঢেলে দিতো। উকিলের চেম্বারে বসে ও এ কথাই ভাবছিলো। উকিলের কথায় ওর সম্বিৎ ফিরে আসে।
'এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকাই আছে তো?'
জলির দেয়া টাকার বান্ডিল দেখিয়ে কথাটি বললেন উকিল। জলি বললো,
'জ্বি। গুনে নিতে পারেন।'
'আসামীর জামিন মঞ্জুর হলে আরো বিশ হাজার দিতে হবে, জানেন তো?'
'জ্বি, জানি। আপনি এর আগেও এ কথা বলেছেন। গত আধা ঘন্টায় এই কথাটি আপনি পাঁচবার বলেছেন।'
জলির কথায় উকিল সাহেব একটু হাসলেন। এরপর বললেন,

‘সব মক্কেলকেই টাকার কথাটি বেশি বলতে হয়। নইলে দেখা যায় পরে তারা টাকা দিতে পারেন না। তখন কান্নাকাটি শুরু হয়। ও সব দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।’
‘আমার বেলায় তা হবে না। আমি টাকা জোগার করেই এসেছি।’
‘তা হলে এক সাথেই সত্তর হাজার টাকাই দিতে পারতেন।’
‘পারতাম। ইচ্ছে করেই দেইনি। আগে জামিন হোক, তারপর বাকী বিশ হাজার দেব।’
‘ঠিক আছে। তবে মনে রাখবেন, জামিন হবার পর কোনো গল্প-টল্প চলবে না। টাকা না পেলে আমি জামিননামায় সাইন করবো না।’
বিমল রায় জলিকে হুঁশিয়ার করে দেন। ওর মনে হলো লোকটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। টাকা ছাড়া যেন কিছুই চেনেন না। জলি অর্থখেকো উকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বললো,
‘বাকী বিশ হাজার টাকা আমি কাল এসে দিয়ে যাবো। আসামীর জামিন না হলে কিন্তু আমার সব টাকা ফেরত দিতে হবে!’
বিমল রায় আবারো ছোট্ট করে হাসলেন। এ হাসিটি যেন নিজের অহংকারের প্রতিফলন। হাসির অর্থ এ রকম যে, বিমল রায় মামলা নিলে আসামীর জামিন না হবার উপায় নেই। তিনি বললেন,
‘কাল বাকী টাকা নিয়ে আসুন। আমি আগামী সপ্তাহে আসামীর জামিনের জন্য আদালতে পিটিশন দাখিল করবো। আশা করি আসামী ছাড়া পাবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।’
বিমল রায় গা এলিয়ে দিলেন চেয়ারে। জলি গলা নামিয়ে বললো,
‘একটা অনুরোধ রাখতে হবে।’
‘কিসের অনুরোধ আবার?’
বিরক্ত প্রকাশ করলেন তিনি। জলি বললো,
‘ভয় নেই, টাকা কমানোর কথা বলবো না।’
‘তবে আবার কিসের কথা?’
‘কথাটি হচ্ছে, আসামী কীভাবে, কেনো এবং কার জন্য জেল থেকে ছাড়া পেল, তা তাকে বলা যাবে না।’
‘মানে?’
‘মানে হচ্ছে, পুলককে কখনো বলবেন না যে, আমি তাকে ছাড়িয়েছি।’
‘কেনো?’
‘সেটা জেনে আপনার কোনো লাভ নেই। যে কোনো কারণেই হোক, আমি চাইনা তিনি জানুক, আমি তাকে জেল থেকে বের করেছি।’
‘ও বুঝতে পেরেছি। তোমাদের মধ্যে কিছু একটা আছে। ঠিক আছে, তা-ই হবে। এটা কোনো শক্ত অনুরোধ নয়।’
‘আমার কথাটি রাখবেন, কিন্তু!’
‘রাখবো, রাখবো। কথা দিচ্ছি।’
‘তাহলে আমি আসি। কাল এসে বাকী টাকা দিয়ে যাবো।’

‘আচ্ছা আসুন। কাল টাকা আনতে ভুলবেন না।’
‘না, না। ভুল হবে না।’
জলি বিমল রায়ের চেম্বার থেকে বের হবার সময় দেখতো পেলো উকিলের সহকারির রুমে বেশ ক’জন লোক বসে আছেন। দু’ জন মহিলাও আছেন। তারা নিশ্চয়ই মামলা সংক্রান্ত কারণে এসেছেন। উকিল সাহেবের দরোজা হা করে খোলা। উকিলের সঙ্গে জলির যে কথা হলো, তা নিশ্চয় তারাও শুনতে পেরেছেন। বিমল রায় এমন প্রকাশ্যে মক্কেলদের সঙ্গে মামলা নিয়ে আলোচনা এবং অর্থিক লেনদেন কেনো করেন, জলি তা বুঝতে পারছে না। উকিল ও মক্কেলদের আলোচনা গোপন থাকাটাই ভালো। বিমল রায় জলির সঙ্গে মামালা ও টাকা নিয়ে যেভাবে আলোচনা করলেন, তা গোপণীয়তার মধ্যে পড়ে না। এ কথা ভেবে ও একটু বিরক্ত হলো তার উপর। ও উকিলের চেম্বার থেকে দ্রুত বের হয়ে এলো। প্রতিদিন কতজন লোককে আসতে হয় উকিলদের কাছে? কী পরিমাণ টাকা লেনদেন হয় আদালাত পাড়ায়? প্রশ্ন দু’টি উঁকি দিল ওর মনে। কিন্তু প্রশ্ন দু’টির জবাব ওর জানা নেই।
‘এই যে, শুনুন!’
জলিকে পেছন থেকে কে যেন ডাকলো। ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ও। দেখতে পেলো ওর পেছনে বোরকা পড়া একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির শুধু মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছে। বয়স ঊনিশ-বিশ বছর হবে। মেয়েটিকে জলি চিনতে পারলো না। ও একটু অবাক হলো। মেয়েটি জলির খুব কাছে চলে এলো। বললো,
‘আপনার সাথে কিছু কথা বলতে পারি?’
‘আমার সাথে! কেনো? আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না!’
‘আমাকে আপনার চেনার কথা নয়।’
‘তাহলে?’
‘আপনি যখন উকেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তখন বাইরের রুমে বসেছিলাম। আপনার সব কথা আমি শুনেছি।’
‘তাতে কি হয়েছে?’
‘না, জানতে চাচ্ছিলাম আপনি দাদার কী হোন?’
‘দাদা? কোন দাদা?
‘পুলক দাদা।’
মেয়েটির কথায় হচকিয়ে গেল জলি। ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কী বলবে তা ও ভাবতে লাগলো। মেয়েটি এবার শব্দ না করে কাঁদতে লাগলো। এতে অপ্রস্তুত হয়ে গেল জলি। ও বললো,
‘তুমি কাঁদছো কেনো?’
মেয়েটিকে ও ‘আপনি’ থেকে তুমি করে বলে ফেললো। মেয়েটি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলো। এক সময় কান্না সামলে বললো,
‘আমার দাদা মাস্তান ছিল না। জানেন, ও এখনো একজন ভালো মানুষ। অথচ..!’

মেয়েটি ফের ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। জলি এ সব কান্নাকাটি পছন্দ করে না। মেয়েরা কথায় কথায় কাঁদবে কেন? ও মেয়েটির হাত ধরলো। বললো,
‘তোমার নাম কি? পুলক তোমার কী হয়?’
‘আমার নাম শায়লা। পুলক আমার ভাই।’
‘ও আচ্ছা!’
শায়লা বললো,
‘আমিও এসেছিলাম উকিলের সাথে কথা বলতে। এসে দেখি, আপনি দাদার জামিনের ব্যাপারে উকিলের সঙ্গে কথা বলছেন।’
‘ওহ্! তুমি একাই এসেছো এই আদালত পাড়ায়?’
‘হ্যাঁ। আমি কাউকে না বলে গোপনে এসেছি। ভাইয়াকে জেল থেকে বের করবে এমন কেউ নেই, তাই..।
মেয়েটির কথা শুনে জলির মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। ওর মন সাধারণত কাঁপে না। এখন একটু কেঁপে উঠলো। শায়লা ফের বললো,
‘আপনি তো বললেন না, আপনি দাদার কী হোন?’
এ কথার কী জবাব দেবে জলি? ও মুখে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে বললো,
‘আমি এর জবাবে যা বলবো, তা তুমি বিশ্বাস করবে না।’
‘তবুও বলুন।’
‘আমার পরিচয় জেনেই বা তোমার কী হবে?’
‘বাহ্ রে, আপনি দাদার জামিনের জন্য এতোগুলো টাকা দিলেন, আর বলছেন আপনার পরিচয় জেনে কী হবে!’
জলি বুঝতে পারলো শায়লাকে সত্য কথাটি বলা দরকার। নইলে ও ভুল বুঝবে। ও বললো,
‘তোমার দাদাকে আমি চিনি না। তবে তিনি আমার উপকার করেছিলেন। তাই ভাবলাম, তাকে জেল থেকে বের করিয়ে দিই। ব্যাস!’
‘তাই বলে এতোগুলো টাকা উকিলকে দিয়ে দিলেন!’
‘ঐ টাকাগুলো আমার তেমন কোনো কাজে লাগতো না। তাই ব্যয় করে ফেললাম।’
‘জানেন, আসতে আসতে ভাবছিলাম, ভাইয়াকে অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনার কেউ নেই। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার আশঙ্কাটা দূর হয়ে গেল।’
‘আমাকে দেখে! কেনো?’
‘বাহ্ রে, আপনি ভাইয়াকে জেল থেকে বের করার জন্য কতগুলো টাকা দিচ্ছেন উকিলকে, নিজের চোখেই তো দেখলাম!’
জলি বুঝতে পারছে শায়লা ওকে নিয়ে ভুল অংক করছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে ওর মন চাইছে না। ভাইয়ের দুরাবস্থায় দুঃখভারাক্রান্ত বোন যদি কিছু দেখে বা ভেবে আনন্দ পায়, ক্ষতি কী? জলি ঐ আনন্দ ভেঙে দেবে কোনো? ও বললো,

‘তুমি তো সবই শুনেছো। তোমাকে আর নতুন করে উকিল ধরতে হবে না। যা করার আমিই করছি। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।’
‘হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে, তা তো বললেন না।’
‘আমার নাম জলি। এ টুকুই আমার পরিচয়।’
‘দাদার সঙ্গে আপনার..?’
‘কোনো সম্পর্ক নেই।’
‘তাহলে..!’
‘একটা দায়বোধ থেকে আমি তোমার দাদাকে জেল থেকে বের করতে এসেছি। তিনি আমাকে দু’বার উপকার করেছেন। তাই ভাবলাম, তাকে একটু সহযোগিতা করি। আমি নিজেকে গোপন রেখেই তাকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি জেনে গেলে। একজন স্বাক্ষী হয়ে গেল।’
‘আমার অবাক লাগছে।’
‘এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত অনেক অবাক হবার মতো ঘটনা ঘটছে। তুমি কী আরও কিছু বলবে? আমাকে যেতে হবে।’
শায়লা কিছু বললো না। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো জলির পায়ের সামনে। ওকে সালাম করলো চট করে। জলির শরীর যেন কেঁপে উঠলো। ও হতভম্ব হয়ে গেল। ও কী শ্রদ্ধা করার মতো কেউ? শায়লা এ কী করলো! ভেতরের তুমুল কাঁপন সামলে নিলো জলি। এ ধরনের আবেগকে প্রশ্রয় দিতে নেই। শায়লা উঠে দাঁড়াতেই জলি কিছু না বলে হাঁটতে লাগলো। ও একবারও পেছনে ফিরে তাকালো না। সবাই কি পেছনে ফিরে তাকাতে পারে? জলির পেছনে অদ্ভূত বিহবলতার আবেশে দাঁড়িয়ে রইলো শায়লা। আদালত পাড়ায় লোকের ভিড়ে চট করেই হারিয়ে গেল জলি।

১০

বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে রশিদ আহমেদ আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশটা খটখটে। সূর্যটা কড়া রোদে জ্বল জ্বল করছে। বাতাসও জোরে বইছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। এমন আবহাওয়া খুব একটা দেখা যায় না। আজকাল আবহাওয়া কেমন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। শীতের সময় বেশি শীত। গরমের সময় বেশি গরম। অসহ্য! হয়তো কলিকাল এসে গেছে। সবকিছু কেমন উলট-পালট। এতোদিন যা দেখে আসছে, এখন তা দেখা যায় না। যেমন রশিদ আহমেদ বরাবরই দেখে এসেছেন রমজান মাসে থাকে প্রচন্ড গরম। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজা রেখে কী কষ্টই না সহ্য করতো! দাবদাহে একেক জনের জিহবা যেন বের হয়ে আসতে চাইতো। দীর্ঘ সময় ধরে সিয়াম সাধনা করে সন্ধ্যায় রোজাদাররা ইফতার করতেন। আর এখন? রোজা হচ্ছে শীতকালে। রোজার সকাল শুরু হতেই ঝুপ করে নেমে আসছে সন্ধ্যা। রোজাদারদের সেই পানির তৃষ্ণা কই? অনাহারের কষ্ট কই? এমন তো তিনি আগে কখনো দেখেননি। কলিকাল

বলে কথা! রশিদ আহমেদ অবসর পেলে এ সব কথা ভাবেন। তিনি প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মের ক্লাশটা নেন। মাঝে মাঝে বাংলা বা সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাশও তিনি নেন। রশিদ আহমেদ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা পেশায় সুনাম অর্জন করতে না পারলেও কৃষিকাজে তিনি সাফলতা অর্জন করেছেন। স্কুলে শিক্ষকতার পর তিনি কৃষিকাজ নিয়েই মেতে থাকেন। তিনি একজন স্বচ্ছল কৃষক হিসাবে এলাকায় পরিচিত। তবে তিনি শিক্ষকতা পেশাও ছেড়ে দেননি। বাড়ির পাশেই স্কুল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন 'স্যার, স্যার' বলে ডাকে, তখন তার মনটা কেমন নেচে উঠে। শিক্ষক বলে গ্রামবাসীরাও তাকে সম্মান করে। তিনি যত বড় কৃষকই হোন কেন, গ্রামের লোকরা কৃষকদের যেন সম্মান করতে কুণ্ঠাবোধ করে। আবার স্কুলের শিক্ষকদের দেখলে তারা সালাম দিয়ে সম্মান জানায়। একজন শিক্ষকের চেয়ে কি একজন কৃষকের সম্মান কম? এই প্রশ্নটার জবাব মাঝেমাঝে খোঁজেন তিনি। রশিদ আহমদের সম্মানবোধটা খুব টনটনে। তিনি অন্যায় কোনো কাজ করেন না, আবার অন্যায়কে সহ্য করতেও পারেন না। গ্রামে তার একটা সম্মানজনক ইমেজ আছে। কিন্তু এই ইমেজটা এখন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সেটা নিজের জন্য নয়, তার ছেলের জন্য। ছেলেটা হঠাৎ করে বখে গেছে। লেখাপড়া শিখেও নষ্ট স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এ নিয়ে তার দুঃখের চেয়ে ক্ষোভটাই বেশি। গ্রামের লোকেরা ছেলের কুকর্ম নিয়ে নানা কথা বলে বেড়ায়। এ সব শুনে লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে যায়। তিনি নীরবে চোখের জল ফেলেন। রশিদ আহমেদ ক'দিন ধরে ভাবছিলেন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন। এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করে দেবার কথা যখন ভাবছিলেন, তখনই মেয়ে শায়লার কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন একটি মেয়ে তার ছেলেকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে। খবরটা শুনে তিনি খুশি হলেন। মেয়েটি নিশ্চয়ই পুলককে পছন্দ করে। নইলে মাস্তান জেনেও মেয়েটি পুলককে জেল থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করবে কেন? রশিদ আহমেদ অনেক মেয়েটির নাম ও বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন। এবং তিনি আজ চলে এলেন জলিদের বাড়ি। জলিদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনি আকাশ দেখছিলেন। আকাশটা আজ মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ। গাঢ় নীল। এমন আকাশ দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। রশিদ আহমেদের মনটাও আজ ভালো।

বাড়ির উঠোনে একজন মধ্য বয়স্ক অচেনা লোককে দেখে অবাক হলো জলি। দরোজায় দাঁড়িয়ে ও বললো,

'আপনি কে? কার কাছে এসেছেন?'

জলির প্রশ্নে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনলেন রশিদ আহমেদ। তিনি জলির দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তোমার নাম কি জলি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?'

'আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম রশিদ আহমেদ। আমি গ্রামের একজন সাধারণ স্কুল মাষ্টার।'

'আপনি আমার কাছে কেনো এসেছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না?'
জলি বিস্ময় প্রকাশ করে। রশিদ আহমেদ মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বললেন,
'তুমি কি আমাকে একটা মোড়া বা চেয়ার দিতে পারো। সেই অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে আছি।'
এ কথায় জলি একটু লজ্জা পেল। ও ঘর থেকে বেতের একটা মোড়া এনে রাখলো উঠোনে। অচেনা কাউকে ঘরে বসতে বলা ঠিক নয়। হোক বয়স্ক মানুষ। রশিদ আহমেদ মোড়ায় বসলেন। জলি কৌতুহলী গলায় বললো,
'আমার কাছে কোনো এসেছেন, তা কিন্তু বলেন নি?'
'বলছি। আমি আমি প্রায় ২০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তোমার কাছে এসেছি বড় আশা নিয়ে।
'আমার কাছে! কেন? আপনার পরিচয় কিন্তু পেলাম না।'
'তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'
'অনুরোধ! আমাকে! আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'
জলির বিস্ময় বাড়তে থাকে। রশিদ আহমেদ বলেন,
'আমি শুনেছি, তুমি পুলককে জেল থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছো। ওকে শুধু জেল থেকে ছাড়ালেই চলবে না, ওকে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি জানি, তুমি সেটা পারবে।'
এবার রহস্যটা পরিস্কার হয়ে গেল জলির কাছে। ও বললো,
'পুলক আপনার কী হয়?
'পুলক? ও, ও আমার ছেলে।'
বিব্রতভাবে জবাব দিলেন রশিদ আহমেদ। জলি বুঝতে পারলো, শায়লার মত ওর বাবাও ভুল অংক করছেন। তাই তিনি ওর কাছে ছুটে এসেছেন। জলি একটু হাসলো। রশিদ আহমেদ জলির উদ্দেশ্যে বললেন,
'ছেলেটা আমার কেনো জানি নষ্ট হয়ে গেলো। লেখাপড়া করছিল। মাষ্টার্স দেবার আগেই ও নষ্ট স্রোতে ভেসে গেল। কেন এমন হলো বুঝতে পারলাম না। ওকে নিয়ে অনেক আশা ছিল, মা!'
জলি বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
'আপনার ছেলে অনার্স পাশ করেছিলো!'
'কেন তুমি জানো না? ও তো অনার্স সম্পন্ন করেছিল। ভেবেছিলাম, মাষ্টার্সটা পাশ করলে ভালো একটা চাকরি করবে। কিন্তু কী থেকে কী-যে হয়ে গেল!'
'আপনার ছেলের জন্য আমারও আফসোস হচ্ছে।'
'শুধু আফসোস করলে হবে না। ওকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনো। তুমিই ওকে ফেরাতে পারবে।'
রশিদ আহমেদের কথায় হাসি পেল জলির। ও হাসি সামলে নিল। জলির মনে হলো, 'পুলকের সঙ্গে যে ওর কোনো সম্পর্ক নেই' এই কথাটি ও যতবারই বলবে, রশিদ আহমেদ

তা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। এক ধরনের লোক আছেন, যারা এতোই সরল যে, নিজে যা ভাবেন বা বিশ্বাস করেন তা থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারেন না। রশিদ আহমেদ সে ধরনের একজন লোক। জলি তার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা না করে বললো,
'ঠিক আছে, আপনি বাড়ি ফিরে যান। আমি আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো।'
'চেষ্টা নয়, মা। আমার অনুরোধটা তোমাকে রাখতেই হবে।'
কঁকিয়ে উঠলেন রশিদ আহমেদ। জলি বললো,
'আচ্ছা কথা দিচ্ছি। আপনি বাড়ি ফিরে যান। দেখি কী করা যায়।'
জলি রশিদ আহমেদকে আপ্যায়নের চেষ্টা করলো না। কারণ, ঘরে কিছুই নেই। হাসিনা খালা খাবার এনে না খাওয়ালে ওকে প্রায়ই উপোস করে থাকতে হয়। বাবার মৃত্যুর পর ওর রান্না করতে ইচ্ছে করে না। রশিদ আহমেদকে কিছু খেতে দিতে না পারায় ও কোনো সঙ্কোচ বোধ করছে না। রশিদ আহমেদ আকাশের দিকে আরেকবার তাকিয়ে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,
'যাচ্ছি মা। আর একটা অনুরোধ ছিল।'
'বলুন।'
'আমি যে তোমার কাছে এসেছিলাম, এটা ওকে বলো না।'
'কাকে?'
'পুলককে।'
'ঠিক আছে, বলবো না।'
জলি মনে মনে বললো, পুলকের সঙ্গে আমার দেখা বা কথা হবে না। রশিদ আহমেদ জলির কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য বললেন,
'আমি আসি, মা।'
রশিদ আহমেদের কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনে শুনে জলির মনে কেমন আবেগ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওর বাবা ওকে সব সময় 'মা' বলে ডাকতো। ও রশিদ আহমেদের দিকে ছলছল চোখে তাকালো। রশিদ আহমেদ ফের বললেন,
'আসি, মা।'
'আচ্ছা,আসুন।'
রশিদ আহমেদ ওদের বাড়ির উঠোন থেকে বেরিয়ে গেলেন। জলি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে। রশিদ আহমেদের ভুল ধারনা এবং ওর কাছে তার অবান্তর অনুরোধের কথা ভেবে ও আপন মনে হেসে উঠলো। ও অনেকদিন হাসেনি। আজ হাসলো। সারাক্ষণ গম্ভীর ও বিষণ্ন হয়ে থাকা জলি যে হাসতে পারে, সেটা কেউ দেখতে পেল না। একটা দমকা বাতাস এসে হামলে পড়লো জলির ওপর। ওর ভালো লাগলো।

১১

এবার দীর্ঘ চার মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেল পুলক। হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে একটা চড় মেরে ভীষণ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল ও। আবশেষে ও ছাড়া পেয়েছে। জেল গেটে দাঁড়িয়ে ও আকাশের দিকে তাকালো। বাইরের আকাশটা অনেক বড়। ঠান্ডু ও রহমত আগেই জানতো পুলক আজ ছাড়া পাবে। গতকাল জজকোর্টে পুলকের জামিন মঞ্জুর হয়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পুলক আর ছাড়া পায়নি। বেল পিটিশন আদালত থেকে জেলগেট পর্যন্ত আসতে সময় লাগে। কচ্ছপের গতিতে কাজ চলে। অবশ্য বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের কাজ জোর গতিতেই চলে। জেলখানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পুলকের জন্য অপেক্ষা করছিল ঠান্ডু ও রহমত। দু'জনের হাতেই দুটো ফুলের মালা। পুলককে দেখেই ওরা দৌড়ে এগিয়ে এলো। পুলকের কাছে এসে ঠান্ডু বললো,

'বস্, এবার মেলা দিন শ্বশুড়বাড়ি থাকলেন! আদর যত্ন কেমন হইছে?'

এ কথা বলেই বড় করে হেসে উঠলো ঠান্ডু। রহমতও ওর কথায় মিটিমিটি হাসছে। পুলক ঠান্ডুর এই তামাশায় রাগ করলো না। ঠান্ডু মাঝেমাঝে সীমা লংঘন করে ফেলে। পুলক আজ সাগরেদদের উপর মেজাজ দেখাতে চায় না। ও বললো,

'তোরা ফুলের মালা নিয়ে এসেছিস কেনো? আমি কি কোরবানীর গরু?'

'বস, আপনি এতোদিন পর ছাড়া পাইলেন, আমরা এই দিনটাকে স্মরণীয় কইরা রাখতে চাই।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, আপনের এখন র‍্যাঙ্ক বাড়ছে। আপনে অনেক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই কইরা জেল থেইকা ছাড়া পাইছেন। আপনের এই জয়ের লগ্নে আমরা ফুলের মালা পড়াইয়া আপনারা সম্মান জানাইতে চাই।'

ঠান্ডু এ কথা বলে পুলকের গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিল। পুলক ওকে বাধা দিল না। রহমতও পুলকের গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিল। এরপর দু'জনে ছোট্ট করে করতালি দিয়ে পুলককে অভিবাদন জানালো। পুলক ওর সাগরেদ দু'জনের উচ্ছ্বাসকে উপভোগ করলো। ও ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলো। ওর দু'পাশে ঠান্ডু ও রহমত হাঁটতে লাগলো। পুলক গলা থেকে মালা দুটো বের করে এনে তুলে দিল ঠান্ডুর হাতে। গলায় মালা পড়ে হাঁটতে ও সঙ্কোচ বোধ করছিল। চেনা বা অচেনা বেশ ক'জন পথচারী পুলককে সালাম দিল। ও সালামের জবাব দিল না। মাস্তানদের সকলে সালাম দেয়। পুলক জানে, যে যত বড় মাস্তান, সে তত বেশি সালাম পায়। চলার পথে মাস্তানরা হরহামেশা সালাম পায়। তবে এই সালামের পেছনে সম্মান থাকে না। ভয় থেকেই তারা সালাম দেয় মাস্তানদের। যারা সালাম দেয়, তারা আবার পেছনে গালিও দেয়। তাই কারো সালাম নেয় না পুলক। তবু অনেকে ওকে সালাম দেয়। হাঁটতে হাঁটতে পুলক ঠান্ডুর উদ্দেশ্যে বললো,

'ঠান্ডু, ঐ মেয়েটির খবর কি, বল?'

'কোন মাইয়ার খবর, বস?'

'ঐ যে জলি না মলি নাম?'

‘বস, তার নাম জলি।’
‘ওকে ওয়াচ করেছিলি?’
‘হ, বস। বাড়িতে একাই থাকে। বাপ মইরা এতিম হইয়া গেছে। বড় অসহায়।’
‘তোর দেখছি, ওর প্রতি মায়া জন্মে গেছে!’
‘বস, মেলা দিন ধইরা তারে লক্ষ্য করতাছি। একলা মাইয়া মানুষ বড় পেরেশানির মধ্যে আছে। আবার একটা বদ লোক মাইয়াটার পেছনে ছায়ার মত লাইগ্যা আছে। ঐ লোকটার হাবভাব ভালো ঠেকতাছে না।’
‘লোকটির নাম কি নিহার গায়েন?’
‘হ, বস। আপনে ওর নাম জানলেন কেমনে!’
ঠান্ডুর বিস্ময়কে উপেক্ষা করে পুলক বলে,
‘লক্ষ্য রাখিস, ঐ মেয়েটিকে যেন নিহার গায়েন কিছু করতে না পারে। ওর সাথে আগে আমার বোঝাপড়া করতে হবে।’
‘ঠিক আছে, বস। আপনে বললে, জলি ম্যাডামরে আস্তানায় নিয়া আসতে পারি।’
‘কি বললি ! জলি আবার তোর কাছে ম্যাডাম হলো কবে!’
পুলকের বিস্ময় আর বিরক্তিতে বিব্রত হয়ে পড়ে ঠান্ডু। ও লজ্জিত গলায় বলে,
‘বস, তিনি খারাপ মেয়ে মানুষ নন।’
এ কথায় রেগে গেল পুলক। ও থমকে দাঁড়ালো রাস্তায়। রাগী গলায় ও ঠান্ডুকে বললো,
‘তুই আমার সামনে থেকে এক্ষুণি চলে যা! আর কখনো আমার সামনে আসবি না!’
ঠান্ডু কঁকিয়ে ওঠে,
‘বস, আপনে রাগ করতাছেন কেন?’
‘তুই আমার সামনে থেকে দূর হ! আর কখনো আমার কাছে আসবি না!’
পুলকের কণ্ঠ গমগম করে ওঠে। ঠান্ডু ভ্যাবাচেখা খেয়ে যায়। ও বুঝে ওঠতে পারেনা কী করবে। ও রহমতের দিকে তাকায়। রহমত ওকে চোখের ইশারায় চলে যেতে বলে। রহমত জানে, পুলকের রাগ কমে আসবে এক সময়। তখন ঠান্ডু এসে ক্ষমা চাইলেই হবে। ঠান্ডু কাচুমাচু করে ঢুকে পড়লো রাস্তার একটি গলিতে। পুলক রহমতের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘রহমত, একটা রিকসা ডাক। হাঁটতে ভালো লাগছে না।’
রহমত রিকসা ডাকলো না। ও পুলকের উদ্দেশ্যে বললো,
‘আপনার জন্য একজন ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করতাছেন।’
‘ভদ্রমহিলা! কে? কেনো?’
‘তার নাম বলেন নাই। শুধু বলেছেন, আপনি জেল থেকে বের হলে যেন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাই।’
‘তিনি কোথায়? আমিই বা তার কাছে যাবো কেন? এ সব তুই কী বলছিস?’
‘বস, আপনার ইচ্ছা হলে যাইতে পারেন। না হলে নাও যাইতে পারেন। আমি তারে কথা দেই নাই। তবে ভদ্রমহিলা সেই ভোর থ্যাইক্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করতাছেন!’

পুলক আকাশ থেকে পড়লো। জেল থেকে ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে সংক্রান্ত সমস্যা। কে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়? একা নয়তো? প্রশ্নটা মনে উঁকি দিয়ে ওঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো একাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। এ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। পুলক শান্ত গলায় জানতে চাইলো,

'ভদ্রমহিলা কোথায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন?'

'সালমা রেষ্টুরেন্টে।'

'তারমানে আরেকটু হাঁটলেই তো সালমা রেষ্টুরেন্ট, তাইনা?'

'জ্বি।'

'ঠিক আছে, চল।'

ওরা সালামা রেষ্টুরেন্টের দিকে হাঁটতে লাগলো। পুলকের মনে একরাশ বিরক্তি এবং কৌতুহল।

পুলককে দেখে একার দু'চোখ ছলছল করে ওঠলো। পুলক একাকে দেখে অবাক হলো না। তবে একাকে বোরকা পড়া দেখে ও অবাক হলো। একাকে ও কখনো বোরকা পড়া অবস্থায় দেখেনি। সালমা রেষ্টুরেন্টের একটি কেবিনে একা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। পুলক কবিনে ঢুকে বসলো গিয়ে একার মুখোমুখি। রহমত রেষ্টুরেন্টের ভেতরে অন্য একটি টেবিলে গিয়ে বসলো। একা পুলকের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। পুলক কৌতুহলী গলায় বললো,

'তুমি কেনো এসেছো?'

এর জবাব দিল না ও। পুলকের মুখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল একা। পুলকের মনে হলো, একা এখন কাঁদবে। মেয়েরা সহজেই কাঁদতে পারে। মেয়েদের অদ্ভুত স্বভাব। কারণে-অকারণে তারা চোখের জল ফেলতে পারে এবং তারা ফেলেও। পুলক একার কান্না দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো। কিন্তু ও কাঁদলো না। একা চোখ তুলে স্বাভাবিক গলায় পুলককে বললো,

'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম! আপনি কেমন হয়ে গেছেন, স্যার! অনেক বদলে গেছেন!'

কথা বলার সময় একার কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠলো। পুলক মুচকি হেসে বললো,

'শুধু আমাকে দেখার জন্যই কি ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ চলে এসেছো!'

এর জবাব দিল না একা। ও প্রশ্ন করলো,

'জেলখানায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনি দেখা করলেন না কেনো আমার সঙ্গে?'

এ প্রশ্নের জবাবে ঝাঁঝালো কণ্ঠে পুলক বললো,

‘তোমার জন্য যে নষ্ট জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি, সেই জীবনটাকে দেখে তোমার কী লাভ বলো তো? বিশেষ কোনো আনন্দ পাও? আর যদি আনন্দ পাও-ও, আমি কোনো তোমাকে সেই আনন্দ পাবার সুযোগ করে দেবো?’

‘ওভাবে বলবেন না, প্লিজ!’

কঁকিয়ে ওঠে একা। পুলকের রাগ কমে না। ও বলে,

‘এই যে, আজ আমাকে দেখতে এসেছো। মায়া দেখাচ্ছো। কিন্তু এই মায়াটা সেদিন কোথায় ছিল? তোমার জবাববন্দিতেই তো আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তাইনা?’

‘হ্যাঁ, স্যার। সেদিন আমার বাবার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলাম।’

‘তবে এখন কেনো আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসো? আমি তো এর কোনো অর্থ খুঁজে পাইনা!’

এবার কেঁদে ফেললো একা। পুলক ওর কান্নাকে উপেক্ষা করে বললো,

‘একা,সত্যি করো বলো তো, এতোদিন পর তুমি আমার কাছে কী চাও?’

এক পর্যায়ে কান্না সামলে নিল একা। ও বললো,

‘আপনার কাছে আসার একটা উদ্দেশ্য আমার আছে।’

‘সেই উদ্দেশ্যের কথাটাই জানতে চাচ্ছি। বলো।’

‘কথা দেন, আমার অনুরোধ রাখবেন।’

‘আগে তোমার অনুরোধটা শুনি। সময় নষ্ট না করে বলে ফেলো।’

‘স্যার, আপনি ওসব ছেড়ে দিন। সুস্থ জীবনে ফিরে আসুন।’

‘কীভাবে ফিরে আসবো? কেনো?’

‘সুস্থ জীবনে ফিরে আসাটা খুব কঠিন হবে না। আপনি ঢাকায় চলে আসুন। মাষ্টার্স পরীক্ষাটা দিয়ে দিন। অথবা ব্যবসা শুরু করুন।’

‘ব্যবসা! টাকা পাবো কোথায়?’

‘আমি আপনাকে টাকা দেবো। যত টাকা লাগে, বলবেন।’

‘আমাকে লোভ দেখাচ্ছো?’

‘না, স্যার। আপনার লোভ যে নেই, তা আমিই তো ভালো করে জানি। লোভ থাকলে সেদিন আমাকে ফিরিয়ে দিতেন না। বরং ফিরিয়ে আনলেন বাড়িতে।’

‘রাখো ওসব কথা। ও সব কথা মনে হলে, ভালো লাগে না।’

‘আচ্ছা ওসব কথা তুলবো না। তাহলে কথা দিচ্ছেন?’

‘কিসের কথা?’

‘ঐ যে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার।’

‘কার জন্য সুস্থ জীবনে ফিরবো? কেনো ফিরবো?’

‘না হয় আমার জন্যই সুস্থ জীবনে ফিরুন।’

‘কী বললে!’

‘রাগ করবেন না,প্লিজ!’

‘রাগ করার মতো কথা বলছো কেনো!’
একা পুলকের রাগ গায়ে না মেখে বললো,
‘স্যার, আপনার শোধ নিতে ইচ্ছে করে না?’
‘কার প্রতি শোধ নেবো?’
‘আমার বাবার প্রতি? আমার প্রতি?’
‘হ্যাঁ, ইচ্ছে করে। কিন্তু কীভাবে নেবো?’
‘আমাকে বিয়ে করে নিতে পারেন। আমাকে বিয়ে করে ছেড়ে দিতেও পারেন।’
খুব সহজভাবে কথাটি বললো একা। এই কথাটি শোনার পর চুপসে গেল পুলক। এর জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারলো না ও। একা তাকিয়ে আছে পুলকের মুখের দিকে। মুহূর্তগুলো কেমন ভারি লাগছে ওর। একা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। পুলকের নীরবতার মধ্যে একটা জবাব ফুটে উঠেছে। এই জবাব বুঝতে পারছে একা। ও বিষন্ন গলায় বললো,
‘জানি, আপনার কাছে আমার কোনো মূল্য নেই। তবু আমি আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। আপনার প্রতি আমি যে অবিচার করেছি, এর প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবো, ভেবে পাই না। গত তিন বছর যাবত একটা মানসিক কষ্টের মধ্যে আছি।’
পুলক একার মুখের দিকে তাকালো। ও কি সত্যিই অনুশোচনায় পুড়ছে? ভাবে ও। একা ফের বললো,
‘স্যার, প্রায় তিন বছর পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আপনি কি আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছেন না?’
এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া অবান্তর। তবু পুলক বললো,
‘হ্যাঁ, পরিবর্তন তো দেখছি।’
‘কী দেখলেন, বলুন না, প্লিজ!’
‘তুমি গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছো। তোমার মধ্য থেকে কিশোরীর চপলতা কমে এসে নারীত্ব জেগে ওঠেছে। তুমি আগে খুব সাজতে। এখন দেখছি, সাজ ছেড়ে বোরকা ধরেছো। তবে এখনো তুমি বিয়ে করোনি, তা দেখে অবাক হয়েছি। ’
এ কথায় যেন খুশি হলো একা। ও বললো,
‘আমি বোরকা ধরিনি, স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোরকা পড়ে এসেছি। বোরকা পড়লে উত্ত্যক্তকারীর হাত থেকে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায়। আদালত পাড়ায় নাকি বখাটে লোকদের ভিড় থাকে, শুনেছি।’
‘ঠিকই শুনেছো। থানা-হাজত বা আদালতে ভালো লোকরা খুব একটা আসেন না। তা তুমি এখনো বিয়ে কেনো করোনি?’
এ প্রশ্নে পুলকের চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে একা বললো,
‘বাবা খুব ওঠে পড়ে লেগেছেন। এবার আমাকে মনে হয় বিয়ে করতেই হবে। তাইতো শেষবারের মতো ছুটে এসেছি আপনার কাছে।’

‘আমার কাছে কোনো এসেছো!’
‘আপনার কাছে কেনো এসেছি, তা আপনি জানেন। আমার যা বলার, তা তো বলেই ফেলেছি। এখন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।’
পুলকের সঙ্গে একার দেখা করার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। একা ওর ইচ্ছার কথা জানাতে রাখ-ঢাক করেনি। পুলক কখনো একাকে বিয়ে করার কথা ভাবেনি। ও কি শোধ নেয়ার জন্য একাকে বিয়ে করবে? প্রশ্নই ওঠে না। তবে একা'র অপরাধবোধ ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। এই মুহুর্ত থেকে একা'র প্রতি ও যেন দূর্বলতা অনুভব করছে। পুলক নিজের ভেতরের ঝড় সামলে নিয়ে একাকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার ভঙ্গিতে বললো,
‘আমার কিছুই বলার নেই। তুমি চলে যাও। রহমত তোমাকে লঞ্চঘাটে নিয়ে যাবে। ও তোমাকে লঞ্চে তুলে দিয়ে আসবে। আর কখনো তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না। আমার জীবন নিয়ে তোমার কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। আমাকে নষ্ট করার দায় থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। যদিও আমার কোনো অভিযোগ ছিল না।’
পুলকের কথায় একা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো একা। পুলক ওর কান্নায় বাধা দিল না। আত্মগ্লানির কান্না কোনো বাধাই মানে না। এ কান্না মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথ দেখায় । পুলক হনহন করে বেরিয়ে এলো সালমা রেষ্টুরেন্টের কেবিন থেকে। রহমতকে হাতের ইশারায় বসে থাকতে বললো। রহমত বসে রইলো রেষ্টুরেন্টের ভেতর। পুলক রাস্তায় বেরিয়ে একটা রিকসা হাতের ইশারায় ডেকে তাতে চড়ে বসলো। আজ ও সারা শহরটা ঘুরে বেড়াবে। অনেকগুলো দিন কারাবাসের পর ও মুক্তি পেয়েছে। মুক্ত বাতাসের স্বাদ পাচ্ছে। আজ ও কোনকিছু নিয়ে ভাবনায় তলিয়ে যেতে চায় না। একার কান্নাকাটি নিয়ে ও কিছুই ভাবতে চায় না। এ ভাবনা অবান্তর।

১২

জলি আজ সুন্দর করে সেজেছে। সাজ-সজ্জা করাটা ও যেন ভুলেই গিয়েছিল। ওকে আজ ওর পরিচিতি কেউ দেখে চিনতে পারবে না কিনা সন্দেহ আছে। মুন্সিগঞ্জ শহরে ওকে যারা চিনেন, তারা কেউ ওকে সাজ-সজ্জা আবস্থায় দেখেননি। তারা আজ ওকে দেখলে ভিড়মি খাবেন, এটা হলফ করে বলা যায়। ও পড়েছে সবুজ রঙের জমিন ও মেরুন পাড়ের টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি। কপালে মেরুনন রঙের বড় একটা টিপ পড়েছে। দু'চোখে টেনেছে কাজল। ঠোঁটে মেরুন রঙের লিপস্টিকের প্রলেপ। খোঁপায় গুঁজেছে বেলিফুলের মালা। ফুলের সৌরভে মৌ মৌ করছে। খুব সাধারণ সাজ। কিন্তু জলিকে অসাধারণ লাগছে। যে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে চট করে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। জলি অবশ্য কাউকে মুগ্ধ করার জন্য সাজেনি। বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে ও সেজেছে। হয়তো এটাই ওর জীবনের শেষ সাজ।
বোটখালের শশ্মানঘাট এলাকাটা বরাবরই নীরব, নির্জন। এখানে রিকসাওয়ালারা খুব একটা আসতে চায় না। এখানে আসতে জলির কোন সমস্যা হলো না। একজন বয়স্ক

রিকসাওয়ালা ওকে শশ্মান ঘাটে এনে নামিয়ে দিল। রিকসাওয়ালা ভাড়া বুঝে নেবার সময় শুধু বললো,
‘মা-জননী, শুনেছি এই এলাকাটা ভালো না। একটু সাবধানে যাইবেন।’
রিকসাওয়ালার এ কথায় জলির কোন ভাবান্তর হলো না। ওর ক্ষতি হবার কী আছে? ও কয়েক পা এগুতেই পরিত্যাক্ত শশ্মানের পুরানো ভবনটির প্রবেশ পথ দেখতে পেল। শশ্মানঘাটের এই পরিত্যাক্ত ভবনটি এক রকম বিধ্বস্ত ভবনই বলা চলে। ভবনের দু’পাশে ঘন বাঁশঝাড়। এর চারপাশের ঘন ঝোপ-ঝাড়। শশ্মান ঘাট এলাকাটি জুড়ে জঙ্গলের পরিবেশ। নির্জন এলাকায় বিধ্বস্ত ও জরাজীর্ণ এই পরিত্যক্ত শশ্মানের ভবনটিকে ভয়কাতুরে লোকেরা ‘ভূতের বাড়ি’ বলে অভিহিত করবেন। জলি ঐ ভবনটির প্রবেশ পথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ঝোপ-ঝাড় থেকে পোকা-মাকড় বা বিভিন্ন প্রাণীর বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। থেমে থেমে ব্যাঙ এর ডাকও শোনা যাচ্ছে। বাতাসে ভাসছে বন্য গন্ধ। তিন বছর আগে এই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে জলির গা ভয়ে ছমছম করে উঠতো। ওর এখন ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জলি এগিয়ে গেলো ভবনটির ভেতরের দিকে। ভবনটিতে প্রবেশ করে প্রথমে ও কাউকে দেখতে পেল না। তবে ভেতরের কক্ষে একটি লোকের ছায়া সরে যেতে দেখলো। ও এগিয়ে গেল ঐ কক্ষের দিকে। এবার ও দেখতে পেল রহমতকে। রহমত জলির পথ আটকে দাঁড়িয়ে রাগী গলায় বললো,
‘কাকে চাই?’
রহমত ওকে চিনতে পারেনি। জলি স্বাভাবিক গলায় বললো,
‘পুলক আছেন? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’
‘আপনার পরিচয়?’
‘আমার পরিচয়টা তাকেই দেব। আপনি পথ ছাড়ুন। আমি তার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।’
‘আপনার পরিচয় না পাইলে আমি পথ ছাড়তে পারুম না। তাছাড়া বস, মাইয়া মানুষের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করেন না। আপনার কী সমস্যা, তা আমারে বলেন।’
‘আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি পুলকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি সরুন তো!’
‘খবরদার! ওখানেই দাড়াইয়া থাকেন। সামনে আসবেন না। আগে আপনের পরিচয় দেন।’
রহমতের হুঁশিয়ারি গায়ে মাখলো না জলি। ও রহমতকে কঠিন একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলো। ঠিক এ সময় ভেতরের কক্ষ থেকে পুলকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,
‘রহমত, ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আসতে দে। তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া। পরিস্থিতি ওয়াচে রাখ।’
রহমত বিরক্তি ভরা মুখে পথ ছেড়ে দিল। ও সতর্ক দৃষ্টি মেলে চলে গেল ভবনটির বাইরে। জলি ছোট পদক্ষেপে প্রবেশ করলো ভবনটির তৃতীয় কক্ষে। কক্ষটি প্রথম দুটি কক্ষের চেয়ে একটু ভালো। দুটি খোলা জানালা ও দরোজা। দরোজা ও জানালার কপাট নেই। একটি জানালার ওপর বসে আছে পুলক। ভাবলেশহীন। কক্ষটির চারপাশে তাকিয়ে নেয় জলি। দেয়াল জুড়ে মাকড়শার জাল। ছাদ ও দেয়ালের অনেক স্থান থেকে আস্তর খসে

পড়েছে। কক্ষ জুড়ে গুমোট গন্ধ। মাস্তানদের আস্তানা হিসাবে মন্দ নয়, ভাবে ও। জলিকে চিনতে পারলো না পুলক। ও ভারি কণ্ঠে বললো,

'বলুন আপনার সমস্য কী? আমার হাতে বেশি সময় নেই। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

পুলকের কথায় মিষ্টি করে হাসলো জলি। ও বললো,

'আমার তো কোনো সমস্যা নেই!'

'তাহলে আমার কাছে কোনো এসেছেন?'

'আপনার একটা সমস্যার সমাধান করতে।'

'আপনি কি রসিকতা করতে পছন্দ করেন? বলে রাখছি, রসিকতা করা বা শোনার আমার সময় নেই।'

পুলকের রাগী গলার জবাব গায়ে না মেখে জলি বললো,

'আপনি আমার পরিচয়টা জানবেন না?'

'আপনার পরিচয় জানার কৌতুহল আমার নেই। কাজটা কী বলুন। আমি কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করি। ন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু করি না।'

'তাই নাকি! মাস্তানরা ন্যায়-অন্যায় বুঝে কাজ করে-এমন তো শুনিনি!'

'আপনি শুধু কথা বাড়াচ্ছেন। কেনো এসেছেন বলছেন না। আপনি কি পুলিশের চর?'

'আপনি কি পুলিশকে খুউব ভয় পান?'

এ কথায় ভীষণ বিরক্ত হলো পুলক। অচেনা এক মেয়ে ওর আস্তানায় কেনো এসেছে এই কৌতুহলই ঘুরপাক খাচ্ছিলো ওর চিন্তায়। এখন এই মেয়ের কথাবার্তা শুনে ও কেমন দ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছে। ও ভালো করে তাকালো জলির দিকে। মেয়েটি অদ্ভূত সুন্দরী। মেয়েটিকে কেমন 'পরী পরী' এবং চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু মেয়েটিকে চিনতে পারছে না। ও গলা নামিয়ে বললো,

'আপনি আমার আস্তানার ঠিকানা কার কাছ থেকে পেয়েছেন, বলুন তো!'

'কোনো আপনি কী দস্যুবনহুরের মতো গোপন আস্তানায় থাকেন নাকি?'

'আশ্চার্য! আপনি দেখছি, আমাকে জেরা করে যাচ্ছেন। আপনি কে?'

এ কথায় খিলখিল করে হেসে উঠলো জলি। পুলক যে ওকে চিনতে পারেনি, এটা ভেবে ওর ভালো লাগছে। ও বললো,

'শুনেছি, আপনি জলি নামের একটি মেয়েকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

এ কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেল পুলক। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো জলির মুখের দিকে। জলি ফের বললো,

'যাকে আপনি খুন করতে চান, সে নিজেই খুন হতে আপনার কাছে আজ এসেছে। আশা করি, আপনি সহজেই খুনটি করতে পারবেন।'

পুলকের মুখে কোনো কথা জোগাল না। এই মেয়েটি কি জলি? প্রশ্নটি ওকে গভীর বিস্ময়ে নিয়ে গেল। কতটা বিস্ময়ে মানুষ থ' হয়ে যায়, তা জানে না পুলক। তবে এই মুহুর্তে ও

গভীর বিস্ময়ের চেয়েও আরো বেশি এক ধরনের অবিষ্টতায় জড়িয়ে যাচ্ছে। পুলকের ঘোরলাগা তন্ময়তাকে ভেঙে জলি বললো,

'আমার বেঁচে থাকাটা অর্থহীন। বরং বেঁচে থাকাটা অনেক কষ্টের এবং বিড়ম্বনার। আমিও মরে যেতে চাই। কিন্তু আত্মহত্যা করার সাহস আমার নেই। তাই, যখন শুনলাম, আপনি আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন আমিও মৃত্যুর জন্য তৈরি হলাম। আপনি অবাক হচ্ছেন? আমি সত্যিই মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে এসেছি।'

এ পর্যন্ত বলে জলি থামলো। পুলক হতভম্বের মতো চেয়ে আছে। ও সত্যিই জলিকে খুন করার কথা ভেবেছে, তাই বলে এমন ভাবেনি যে, জলি নিজে এসে খুন হবার জন্য ওর সামনে দাঁড়াবে। এ যেন রহস্যময় এক গল্প। 'জলি নিশ্চয় ঠান্ডুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এসেছে' ভাবে পুলক। জলির প্রতি পুলকের তীব্র ক্ষোভ এই মুহূর্তে কেমন মিইয়ে যাচ্ছে। ওর কৌতুহল বাড়ছে। পুলক কৌতুহল চেপে বললো,

'আপনার মতো একজন অকৃতজ্ঞ মেয়েকে খুন করাই আমার উচিত।'

'তাহলে খুন করুন। আমি তো আপনার আস্তানায় এসে পৌঁছেছি। কীভাবে খুন করবেন, ঠিক করে নিন।'

বিব্রত কণ্ঠে পুলক বললো,

'এটা কি করে হয়? আপনি নিজে এসে খুন হতেই বা চাচ্ছেন কেনো?'

'সেটা তো আপনার জানার দরকার নেই। আপনি আমাকে খুন করতে চান। আমি আপনার কাজটি সহজ করে দিয়েছি। আপনি আমাকে অপহরণ করে এনে খুন করতেন বা কোথাও না কোথাও আমাকে প্রকাশ্যে খুন করতেন। সেটা হতো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে ঝুঁকি নেই। আমিও প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য।'

'আপনি কি মানসিকভাবে অসুস্থ?'

'খুন করার জন্য কি মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থার প্রয়োজন আছে?'

'আপনি দেখছি, আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলছেন! আমি..আমি..!'

'আপনি উত্তেজিত হলে, আমার প্রতি রাগ বাড়লে খুনের কাজটি একটু সহজে করতে পারবেন। কী করলে আপনি বেশি রেগে যান, তা বলুন তো। আমি তাই-ই করবো।'

এ কথায় পুলক কেমন হতাশ হলো। যাকে সে খুন করবে বলো ভেবেছিল, এখন মনে হচ্ছে সে তাকে খুন করতে পারবে না। জলির অকৃতজ্ঞতাকে অবশ্য ক্ষমা করা যায় না। পুলক বললো,

'আমি মনে হয়, আপনাকে খুন করতে পারবো না। তবে আপনার প্রতি আমার অনেক রাগ ছিল। সেটা থাকাটাও স্বাভাবিক। আপনি একজন অকৃতজ্ঞ শ্রেণীর মানুষ।'

'তাহলে খুন করতে অসুবিধে কোথায়?'

'আমি পেশাদার খুনি নই যে, বললেই খুন করতে পারি। তাছাড়া আমি আমার মাইন্ড চেইঞ্জ করেছি। আপনি চলে যান। আপনার ভয় নেই। আমি ভবিষ্যতে আপনার কোনো অপকার বা উপকার কোনটাই করবো না। এখন যান, প্লিজ!'

‘এটা কি বলছেন! আমি তো বেঁচে থাকতে চাই না। আমি যে বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি।’
‘আশ্চার্য! আপনি খুন হতে চাচ্ছেন কেনো! আমিই বা আপনার ইচ্ছাপূরণ করবো কোনো!’
পুলকের কণ্ঠে বিস্ময়। জলি কেমন মুষড়ে পড়ে। ওর চোখ দুটি বিষণ্ন হয়ে যায়। ও কোনো কথা বলে না। একতাল বন্য বেদনা ওর ভেতরে পেখম ছড়িয়ে যায়। এ বেদনার কথা বলা যায় না। জলি বিষণ্ন চোখ তুলে বলে,
‘মৃত্যু ছাড়া আমার যে আর কোন পথ জানা নেই। ভেবেছিলাম, আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন সেই গন্তব্যে। এখন দেখছি, তা আর হচ্ছে না।’
এ পর্যন্ত বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জলি। অনেকদিনের জমাট বাধা কান্না খরস্রোতের মতো নেমে এলো দ'চোখ থেকে। ওর শরীরটা কেঁপে উঠছে। এ ধরনের কান্নার কারণ কি অথবা কান্না থামানোর উপায়ই বা কি-এর কোনোটাই জানে না পুলক। পুলক নিঃশব্দে জলির কান্না দেখতে লাগলো। জলির কান্না খুব অল্প সময়ের মধ্যে থেমে গেল। ও একটু লজ্জিত হলো। শাড়ির আঁচল দিয়ে ও দ্রুত মুখ মুছে নিল। এ সময় চোখের কাজল খানিকটা লেপ্টে গেল চোখের কোণে। পুলক মনযোগ দিয়ে তা দেখলো। জলি নিজেকে সামলে নেয়া গলায় বললো,
‘সরি, হঠাৎ করে কেঁদে ফেললাম। মরতে এসে মরতে না পারার বেদনায় কান্না এসে গেল। আপনি কিছু মনে করবেন না।’
পুলক এর জবাবে কিছু বললো না। জলি ওর কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বললো,
‘আমি তাহলে যাই। অহেতুক আপনার সময় নষ্ট করলাম।’
পুলক নরোম গলায় বললো,
‘চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।’
এ কথায় কণ্ঠে রাগ তুলে জলি বললো,
‘আপনি কোনো আমাকে এগিয়ে দেবেন? আপনার সাথে আমার কী সম্পর্ক যে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে?’
‘সব কিছু সব সময় সম্পর্কের উপর নির্ভর করেনা। কখনো কখনো সময় সম্পর্ক তৈরি করে।’
জলির চোখে চোখ রেখে পুলক কথাটি বললো। জলি বললো,
‘ঠিক বুঝলাম না। সময় আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তৈরি করলো!’
‘এই মুহূর্তে আমি এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবো না। কোনো জানি মনে হচ্ছে, আপনার ভেতরে চেপে রাখা দহনের সঙ্গে আমার দহনের একটা মিল আছে। আপনি জানেন কি, আনন্দের চেয়ে বেদনার বন্ধুত্ব দ্রুত হয় এবং তা গভীরও হয়?’
‘আপনি আমার কান্নার ভুল ব্যাখ্যা করছেন। মরতে না পারার কান্না নিয়ে নিজের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করবেন না, প্লিজ!’
‘জলি, আপনি মরতে না পারার জন্য কাঁদেননি। বেদনার কান্না আমি বুঝতে পারি।’

পুলকের এ কথায় কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেল জলি। ও কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না। নীরব থাকার মধ্য দিয়ে ও যেন পুলকের কথাটিকে মেনে নিল। পুলক এবার বললো,
‘চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।’
এ কথা বলে পুলক কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। জলি নিঃসঙ্কোচে অনুসরণ করলো ওকে। নিজের সাজ-সজ্জা নিয়ে এখন ওর ভীষণ লজ্জা লাগছে। এমনভাবে সেজে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ি ফিরবে-এ কথা ভাবতেই ওর কেমন লজ্জার শিহরণ লাগছে। সে এক অদ্ভূত মধুর শিহরণ!

১৩

জলি কি এমন একটি বিকেলের স্বপ্ন দেখেছিল? ওর মনে হচ্ছে এমন স্বপ্ন ও মনের ক্যানভাসে এঁকেছিল। তবে কবে এঁকেছিল, তা ওর মনে আসছে না। আজকের বিকেলটি যেমনি অদ্ভূত, তেমনি অপ্রত্যাশিত। ও মনে মনে আজকের বিকেলের একটা নাম দিল ‘হিরন্ময় বিকেল’। আজকের বিকেলটি প্রতিদিনের চেনা বিকেলের মতো নয়। চারপাশের দৃশ্যগুলোও কেমন বদলে গেছে। সবকিছুতে মোহনীয় দ্যুতি ফুটে উঠেছে। চেনা পথ দিয়েই ও যাচ্ছে, অথচ পথটিকে ও চিনতে পারছে না। মনে হচ্ছে, পথটি অজানা সুন্দরের গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। এমন কেনো মনে হচ্ছে, ও তা বুঝতে পারছে না। ওর ভেতরে এক ধরনের শিহরণ কাজ করছে। মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভূত ভালো লাগছে ওর। আবার এই ভালো লাগা নিয়ে ও নিজে নিজেই অবাক হচ্ছে। এমন তো হাবার কথা নয়। জলি আলতো করে নিজের হাতে চিমটি কাটলো। চিমটি কেটে বুঝতে পারলো ও কোনো স্বপ্ন দেখছে না। রিকসা চলছে ধীর গতিতে। জলির পাশে নিঃশ্চুপভাবে বসে আছে পুলক। জলি চট করে এক পলক তাকালো পুলকের দিকে। বিকেলের করোজ্জ্বাল আলোয় অন্য মনস্ক পুলককে দেবদূতের মতো লাগছে। ওকে কেমন লাগছে, কে জানে। ভাবলো জলি। ওর ইচ্ছে হলো পুলককে জিজ্ঞেস করে জানতে, ওকে কেমন লাগছে দেখতে। এ কথা ভাবতেই ও কেমন লজ্জায় কেঁপে উঠলো। আশ্চার্য! যে জলি পুরুষদের তীব্রভাবে ঘৃণা করে, সে আজ একজন পুরুষের পাশে বসে কেমন বিহবল হয়ে যাচ্ছে! এটা কি ঐশ্বরিক কিছু? অপ্রার্থিব কোনো ইঙ্গিত? ভাবে ও। ও এখন অনেক কিছু ভাবছে। যে ভাবনার কোনো মাথা-মুন্ডু নেই। কোনো অর্থ নেই। তবু ও ভাবছে। ভাবতে ওর ভালো লাগছে। এই যে ওর ভালো লাগছে, এটা তো বিস্ময়ের চেয়ে আরো বেশি কিছু। রহস্যের চেয়েও গভীর রহস্যময়। আজ কে এই রহস্য সৃষ্টি করলো? পুলকের পাশে বসে জলি তন্ময়ভাবে এ ধরনের নানা প্রশ্নের জবাব হাতরে বেড়াচ্ছিলো। পুলকের কথায় ওর তন্ময়তা ভাঙে।
‘জানেন, একটা কথা ভেবে আমি অনেক অবাক হচ্ছি।’
এ কথায় জুলির বুকের ভেতর হৃৎ কম্পন বেড়ে গেল। ও বললো,
‘কী কথা ভাবছেন?’

‘আপনাকে খুন করার কথা ভেবেছিলাম। খুন হয়তো করতে পারতাম না। তবে আপনার প্রতি তীব্র রাগ কিন্তু ছিল। অথচ আজ আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।’
‘আমার প্রতি আপনার তীব্র রাগটা মিলিয়ে গেল কেনো?’
এর জবাব দিল না পুলক। অন্য সময় হলে জলি এ ধরনের প্রশ্ন করতো না বা প্রশ্ন করে জবাব না পেলে ফের প্রশ্ন করতো না। কিন্তু এখনকার জলি নিজের বৈশিষ্টে নেই। ও ফের বললো,
‘বললেন না, আপনার রাগটা মিলিয়ে গেল কেনো?’
পুলক বললো,
‘হয়তো আপনার মরে যাবার ইচ্ছা এবং আকুতি আমাকে স্পর্শ করেছে। অনেক বেদনায় বিমর্ষ হয়েই একজন মানুষ মরে যেতে চায়। এটা জীবনের চরম অসায়ত্ব।’
‘তাহলে আমার অসায়ত্ব দেখে করুনা করেছেন?’
‘করুনা কিনা জানি না, আপনার অসায়ত্ব আমাকে বিচলিত করেছে। আমার সহানুভূতি জাগিয়ে দিয়েছে। রাগটা উল্টো মায়ায় পরিণত হয়েছে। সব কিছু হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। মানুষ তার মনের বিরুদ্ধে সহজে যেতে পারে না। আমিও যাইনি। মন বললো, আপনাকে এগিয়ে দিতে, তাই আপনার সঙ্গে চলে এলাম।’
‘আপনি কি সব সময় মনের নির্দেশ মানেন?’
‘চেষ্টা করি মানতে।’
‘তাহলে একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন?’
‘বলুন কী প্রশ্ন?’
‘আপনি যে মাস্তানী করেন, এতে কি আপনার মনের সায় আছে?’
জলির এ প্রশ্নে হচকিয়ে গেল পুলক। ও কয়েকটা মুহুর্ত চুপ থেকে বললো,
‘এটাও সত্যি, অনেক সময় মনের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করি। তবে আপনার প্রতি রাগ ধরে রাখার কোনো তাড়না নিজের মধ্যে ফিল করিনি। হয়তো আপনার কোনো জাদু আছে।’
এ কথায় খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো জলি। হাসির দমকায় ওর শরীর কাঁপতে লাগলো। জলির হাসির ফল্গুধারায় পুলক ভেসে গেল সঙ্কোচ আর ভালোলাগার আবিষ্টতায়। জলির হাসি এক সময় থামলো। ও হাসিভরা মুখে বললো,
‘অনেকদিন এমন হাসিনি।’
‘আমি কি হাসির কথা বলে ফেলেছি?’
‘নয়তো কি? আমার জাদু আছে শুনলে পাখ-পাখালি, বন্য পশু পর্যন্ত হাসবে।’
পুলক এর জবাবে কিছু বললো না। কিন্তু ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ও নিজেকে সামলে নিল। জলি পুলকের নীরবতা দেখে বললো,
‘একটা কথা বলবো।’
‘বলুন।’
‘আপনি মাস্তানী ছেড়ে দিন।’

‘কেনো?’
‘ওটা আপনার কাজ নয়?’
‘তাই নাকি?’
‘হ্যাঁ। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওটা আপনার কাজ নয়। এ লাইনে আপনি সুবিধে করতে পারবেন না।’
‘আমি কি সুবিধের জন্য কিছু করছি?’
‘তবে কেনো করছেন? কি পাচ্ছেন মাস্তানী করে?’
এর জবাবে পুলক উদাস গলায় বললো,
‘আমি জড়িয়ে গেছি। এখন ফেরার পথ নেই। আমি নষ্ট হয়ে গেছি!’
‘কে বলেছে পথ নেই? তাছাড়া আপনি এখনো নষ্ট হননি। আপনি চাইলেই সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারেন। এর জন্য আপনার ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। আমার মনে হয়, আপনার ও সব ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উচিত।’
‘কেনো?’
‘আপনি নির্দয় বা হিংস্র শ্রেণীর মানুষ নন। আপনাকে ও সব কাজে মানায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আপনার জন্য আপনার মা-বাবা ও বোন ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। তাদের কষ্ট দেয়া ঠিক হচ্ছে না। আপনি একজন শিক্ষত লোক। এভাবে নষ্ট হবার কোনো মানে হয়?’
পুলক ভীষণ অবাক হলো জলির কথা শুনে। ও বললো,
‘আপনি আমার সম্পর্কে দেখছি, অনেক খবর জানেন!’
‘ঘটনাক্রমেই তা জেনেছি। আপনাকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কোনো কৌতুহল ছিল না।’
‘ছিল না মানে, এখন আছে?’
এ প্রশ্নে জলি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন প্রশ্নটি শুনতে পায়নি। রিকসা চলছে। মৃদু ঝাঁকুনি লাগছে। জলি কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। পুলক বললো,
‘মাস্তানী ছেড়ে দেবার সাজেশন দিলেন। কিন্তু মাস্তানী ছেড়ে দিয়ে কী করবো, তা বললেন না।’
এর জবাবে একটু ভেবে জলি বললো,
‘প্রথমে এই শহরটা ছেড়ে দিন। নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান। মাষ্টার্সটা দিয়ে দিতে পারেন। এরপর একটা চাকরি জুটিয়ে নিবেন। অথবা ব্যবসা শুরু করতে পারেন। খুব সহজ। আপনার জীবনে কোনো জটিলতা তো দেখছি না। আপনি ভুল পথে চলে নিজেই নিজের জীবনকে জটিল করে তুলছেন।’
পুলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। জলি বললো,
‘আমি কি আশা করতে পারি যে, আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন?’
‘এতে আপনার লাভ?’

'বাহরে! আমার আবার লাভ কিসের! আপনার লাভের জন্যই আপনি তা করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আমার একটা লাভ হবে। আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে, আমি আনন্দ পাবো এই ভেবে যে, একজন মানুষ আমার কথা রেখেছে।'
পুলক বললো,
'আপনার কথা বুঝি কেউ কখনো রাখেনি?'
এই প্রশ্নে থমকে গেল জলি। রিকসার ঝাঁকুনির চেয়ে বেশি ঝাঁকুনি লাগছে মনে। ও বিষণ্ন গলায় আলতো করে বললো,
'আমিও একটা মানুষ! আমার কথা কে রাখবে, কে-ই বা রাখবে না, তা নিয়ে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। পুলক সাহেব, আমার জীবন শুধু নষ্টই না, পচে গেছে!'
এ কথা বলতে গিয়ে জলির কণ্ঠ ভারি হয়ে এলো। পুলক ঘাড় ঘুরিয়ে জলির মুখটা দেখার চেষ্টা করলো। জলি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। একতাল বন্য বেদনা জলের ধারা হয়ে নেমে আসতে চাইছে জলির দু'চোখ বেয়ে। ও সামলে নেবার চেষ্টা করছে। হিরন্ময় বিকেলটা হঠাৎ করে কেমন ফিকে হয়ে আসছে। গোধূলীর পেয়ালায় যেমন শেষ বিকেলের রোদ জমে যায়, জলিও জমে যেতে লাগলো নিজের অন্তর্গত কষ্টে। পুলকও আর কোনো কথা বললো না ঠিক, তবে ওর মনে অনেক কথা ভেসে বেড়াতে লাগলো। কেন জানি, ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো জলির একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিতে। ও ইচ্ছের লাগামটাকে টেনে ধরে রাখলো। মন চাইলেই সব সময় সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না।

১৪

জলিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই পুলকের মোবাইল ফোন বাজলো। ও ফোন অন করলো। ও প্রান্তে ঠান্ডু। ও বললো,
'বস, শালা গায়েনের দুই হাত পিছমোড়া কইরা বাইন্ধ্যা আস্তানায় ফালাইয়া রাখছি। সকাল থেইক্যা দুপর পর্যন্ত তিন গ্লাস পেচ্ছাব খাওয়াইছি। প্রথমবার বমি করছিলো। পরে আর বমি করে নাই।'
পুলক মনযোগ দিয়ে ঠান্ডুর কথা শুনলো। এই প্রথম ঠান্ডুর একটা কাজে ও সন্তুষ্ট হলো। ও নিহার গায়েনকে আস্তানায় ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিল। ঠান্ডু কাজটি করতে পেরেছে। ওকে কোনো দায়িত্ব দিলে ও ঠিকমত তা পালন করতে পারে না। অনেক সময় গন্ডগোল বাধিয়ে ফেলে। কিন্তু এবার কাজটি করতে পেরেছে এবং এক ধাপ এগিয়ে ও নিহার গায়েনকে শাস্তি পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে। যদিও এ ধরনের নির্দেশ পুলক ওকে দেয়নি। পুলক নিহার গায়েনের শাস্তির বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামালো না। পুলকের কোনো জবাব না পেয়ে ঠান্ডু বললো,
'বস, অর্ডার দেন, গায়েন শালারে প্রতিদিন সকালে গরম পেচ্ছাব খাওয়াইয়া দেই। একমাস খাওয়ালেই হইবো। এরপর আর শালায় গান গাইতে পারবো না। গান গাইতে গেলেই গলা

দিয়া সুরের বদলি বকবক কইরা পেচ্ছবের বদ গন্ধ বাইর হইয়া আসবো। গায়েনের মুখ থেইক্যা সুরের বদলে পেচ্ছাবের দুর্গন্ধ! হা-হা-হা।'
ঠান্ডুর কথা শুনে পুলকও না হেসে পারলো না। ও বললো,
'ওকে আরো কঠিন শাস্তি দিতে হবে। ভয়ানক শাস্তি। এমন শাস্তি দিবি, ও যেন জীবনে জলিকে বিরক্ত করার আর কখনোই সাহস না পায়।'
এ কথায় ভীষণ উৎসাহ পেয়ে ঠান্ডু বললো,
'বস, শালারে পাগলা কুত্তা দিয়া কামরাইয়া দেই?]
'পাগলা কুকুর পাবি কোথায়?'
'আছে বস, আমার কাছে পাগলা কুত্তার সন্ধান আছে। আপনে খালি অর্ডার দেন!'
'আমি ভেবে দেখি।'
'ভাবনার কিছু নাই, বস। শালারে হাফ মার্ডার কইরা ফালাইতে হইবো। শালায় একটা হারামজাদা বজ্জাত!'
'আমিও জানি ও একটা বজ্জাত!'
'তাইলে শালার গোপন অঙ্গে জংলি বিচ্ছা ছাইড়া দেই?'
'চুপ কর! কী করতে হবে, তা আমাকে ভাবতে দে।'
পুলক একটু ধমকে ওঠে। চুপসে যায় ঠান্ডু। ও বলে,
'ঠিক আছে, বস। আপনে ভাইবা আমারে বইলেন। আমি কিন্তু শালারে পেচ্ছাব খাইয়াই যামু!
প্রতিদিন সকালে পেচ্ছাব খাইয়াইয়া গায়েন শালারে রেওয়াজ করামু। ওর সারে গামা পাদা নিসা বাইর কইরা ফালাইমু!'
'ঠিক আছে, তোর সাথে পরে কথা হবে। সাবধানে থাকিস!'
'আচ্ছা বস।'
পুলক ফোন রেখে দেয়। ঠান্ডুর একটা বিষয় ওকে খুউব অবাক করেছে। ঠান্ডু মেয়ে মানুষদের একেবারেই পছন্দ করে না। সব সময় গালাগাল দিয়ে কথা বলে। এই প্রথম ও জলিকে সম্মান করে কথা বলছে। জলির ব্যাপারে ও সহানুভূতিতে ভীষণ বিগলিত। পুলক বুঝতে পেরেছে, ঠান্ডুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই জলি ওর গোপন আস্তানায় গিয়েছিল। জলি ঠান্ডুকে কীভাবে বশ করেছে, তা জানে না পুলক। জলিকে অনুসরণ করার দায়িত্ব ঠান্ডুকে দেয়ার পর থেকে ওর মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে। এরপর থেকেই ঠান্ডু জলির পক্ষে নিয়ে কথা বলে। 'এর কারণটা বের করতে হবে' ভাবে পুলক। ও এ ভাবনার রেশ নিয়ে ও জলিদের বাড়ির ছোট্ট উঠোনে ঢুকে পড়লো। উঠোনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুলক ডাকলো,
'মামা কি বাড়িতে আছেন?'
কোন জবাব এলো না। কিন্তু ঘর থেকে বের হয়ে এলো জলি। গায়ে মলিন শাড়ি। শাড়ির আঁচল কোমড়ে বাঁধা। পুলককে দেখে চোখে অবাক দৃষ্টি মেলে জলি বললো,

‘আপনি!’
পুলক মুচকি হাসলো। বললো,
‘কেমন আছেন?’
‘ভালো। আপনি?’
‘আমি ভালো নেই।’
‘কেনো? কি হয়েছে?’
‘তেমন কিছু হয়নি। আপনি বিচলিত হবেন না।’
‘তাহলে যে বললেন, ভলো নেই!’
‘না, এখন ভালো আছি। আপনাকে দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল।’
এ কথায় ভীষণ হাসি পেল জলির। ও সামলে নিল। বললো,
‘আপনি কাকে ডাকছিলেন, বলুন তো!’
‘আপনার মামাকে।’
‘আপনি আমার মামাকে চিনেন কীভাবে?’
‘কাল রাতেই তার সাথে পরিচয় হলো। লঞ্চঘাট থেকে আমি তাকে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম।’
‘ওহ্, আচ্ছা! মামা আমাকে বলেছিলেন যে, একজন সুদর্শন ও ভদ্র যুবক তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।’
‘ভাগ্যিস, আপনার মামা আমার আসল পরিচয় জানেন না!’
এ কথা বলেই পুলক হো হো করে হেসে ফেললো। জলি দেখলো পুলক খুউব প্রাণ খুলে হাসতে পারে। যে এমনভাবে হাসতে পারে, সে মাস্তানী কীভাবে করে? হাসি থামার পর পুলক বললো,
‘আপনার মামা কি বাড়িতে আছেন?’
‘না, তিনি একটু বাইরে ঘুরতে গেছেন। আপনি কি মামার কাছেই এসেছেন?’
এই প্রশ্নে একটু ভড়কে গেল পুলক। ‘জলি কি অন্য কিছু মীন করছে?’ ভাবে পুলক। ও বলে,
‘আমি আপনার মামার কাছে যা বলতে এসেছি, তা আপনাকেই বলতে পারলে ভালো হয়। তবে কথাটি আপনার মামার কাছে প্রথমে বলতে চেয়েছিলাম।’
পুলকের কথায় জলি কেমন সর্তক হয়। ‘পুলক কি ওকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলতে চায়?’ প্রশ্নটি জেগে ওঠে ওর মনে। ও পুলকের চোখে চোখ রাখে। বলে,
‘মনে হচ্ছে, আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন?’
‘হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আমি যা বলতে চাই, তা আপনার আমার দু’জনেরই জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
‘দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আপনার জন্য একটা মোড়া নিয়ে আসি।’

এ কথা বলে জলি ওদের ঘরের ভেতর যাবার চেষ্টা করতেই পুলক বললো,
'দাঁড়ান,প্লিজ! আমার মোড়া লাগবে না। আমি দাঁড়িয়েই কথা বলতে চাই।'
'গুরুত্বপূর্ণ কথা এভাবে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবেন! আপনি কি পাগল নাকি?'
'কখনো কখনো আমার মধ্যে 'পাগলামি' কাজ করে ঠিক। তবে এখন আমি যা করতে চাচ্ছি, তা অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'
'কী করতে চাচ্ছেন, বলুন তো! আজ আপনার কথা শুনতে আমার কেন জানি ভয় ভয় লাগছে!'
এ কথায় হেসে ফেললো পুলক। ও হাসিমুখে বললো,
'আমি কিন্তু আপনাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য আসিনি। আপনাকে জয় করতে এসেছি।'
কোথাও কি বজ্রপাত হলো? কিংবা ভূমিকম্প? জলির ভেতরে ভুমিকম্পই হচ্ছে। ওর ভেতরে ভীষণ একটা ভাংচুর শুরু হলো। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাথা যেন ভন ভন করে ঘুরছে। ওর বিশ বছরের জীবনে এমন কখনো হয়নি। ও কথা বলতে গিয়ে বলতে পারলো না। ওর কণ্ঠ যেন আটকে গেছে। ও হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো পুলকের দিকে। পুলক একটু সময় নিয়ে ফের বললো,
'আমি জানি, আমি একজন নষ্ট মানুষ। নিজের যোগ্যতা নিয়ে আমি নিজেই সন্দিহান। তবু একটা অদ্ভূত স্বপ্নের ভীষণ রকম তোলপাড় চলছে আমার ভেতরে। এই স্বপ্নটা দেখছি আপনাকে নিয়ে। আমি, আমি..'
এ পর্যন্ত এসে পুলকের গলা আবেগে ভরে এলো। ও 'আমি আমি' করার সময় জলি বললো,
'চুপ করুন,প্লিজ!'
ও নিজের দু'কানে দু'হাতের তালু চেপে ধরলো। 'পুলক ওকে এ সব কি বলছে!' অপার বিস্ময়ে জলি থ'। ও দু'চোখ বন্ধ করে নিল। চোখ ফেটে অঝোর কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। সামলে নেয় ও। কয়েকটা মুহূর্ত পর জলি ওর কান থেকে দু'হাত নামিয়ে আনলো। পুলক তখন নরোম গলায় বললো,
'আমি কি সুন্দর একটা স্বপ্ন রচনা করে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারি না?'
জলির মনে হলো ওর কথা বলাটা খুবই জরুরি। এরপর চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। ও শুকনো কণ্ঠে বললো,
'যাকে নিয়ে আপনি সুন্দর স্বপ্ন রচনা করতে চান, তার মধ্যে সুন্দরের সোপান নেই। সে একটা নষ্ট-পচা জীবনকে বয়ে বেড়াচ্ছে। বেঁচে থাকলেও কার্যত সে মৃত। আপনি তার সব কথা জনেন না, পুলক সাহেব। যদি জানতেন, তবে তাকে নিয়ে স্বপ্ন সাজানোর সাহস পেতেন না।'
জলির জবাবে অস্বস্থিতে কেটে গেল পুলকের। ও বললো,
'আপনি এখানে ভুল করছেন। আমি আপনার সবচেয়ে বড় বেদনার কথাটি জানি। সব জেনে এবং মেনে আমি আপনাকে নিয়ে একটা সুন্দর জীবন গড়তে চাই।'
এ কথায় একটু রেগে গেল জলি। ও একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বললো,

‘আপনি কি আমার সব হারানোর কথা জানেন?’
‘জানি।’
‘তারপরও একজন ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে আপনি স্বপ্ন সাজাতে চান? কেনো? আপনি কি মানসিক বিকারগ্রস্থ লোক? নাকি আমাকে করুনা করে মহানুভবতার তৃপ্তি পেতে চাইছেন?’
এ পর্যন্ত বলে কেঁদে ফেললো জলি। দু’চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এলো। কান্নার যে পবিত্র একটা রূপ আছে, এই মুহুর্তে বুঝতে পারলো পুলক। জলির কান্না ভালো লাগলো ওর। এ ধরনের কান্না চেপে থাকা ভারি বেদনাকে হালকা করে দেয়। জলির কান্নাটা যখন হঠাৎ বৃষ্টি থামার মতো থেমে গেল, তখন পুলক বললো,
‘হ্যাঁ, আপনাকে বিয়ে করে আমি তৃপ্তি পেতে চাই। তবে এই তৃপ্তি মহানুভবতার তৃপ্তি নয়। আমি ভালোবাসতে পারার তৃপ্তি পেতে চাই। ভালোবাসার তৃপ্তি চাই। ভালোবাসা পাবার আনন্দ চাই। জীবনের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়ার মতোই আমার এই চাওয়া। নিজেকে মহৎ করার কিংবা আপনাকে করুনা করার কোনো বিষয় এখানে নেই। তবে হ্যাঁ, আপনার জীবনের গোপন কষ্টের কথা জেনে আমার খুবই খরাপ লেগেছে। আপনার প্রতি এক অদ্ভূত টান সৃষ্টি হয়েছে। এই টানকে ‘ভালোবাসা’ বললে ভুল হবে না।’
জলি আবার ওর কান দুহাতের তালুতে চেপে ধরলো। শব্দহীন চোখের জল বেদনা বিধুর অনেক শব্দের ব্যঞ্জনায় নেমে আসছে ওর গাল বেয়ে। পুলক জলির ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর জলি কান থেকে দু’হাত সরিয়ে বললো,
‘আপনি এখন যান,প্লিজ!’
পুলক ওর রাগকে উপেক্ষা করে বললো,
‘আমি তো খালি হাতে ফিরে যাবার জন্য আসিনি।’
‘প্লিজ, পুলক সাহেব, প্লিজ! আমাকে নিয়ে এ খেলার কোনো মানে হয়না। আপনি কেনো এমন কথা বলছেন!’
জলির এই প্রশ্নের জবাবে পুলক বললো,
‘আমি জীবনে খুব বেশি কিছু চাইনি। আমার চাওয়ার আকাঙ্খা খুব কম। কিন্তু যখন কিছু চাই, তখন তা তীব্রভাবেই চাই। আপনি আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।’
‘আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না! আমি, আমি আপনার যোগ্য নই। কেনো আমাকে প্রলুব্ধ করছেন?’
‘জলি, আপনি আবারো ভুল বকছেন। আমি আপনাকে... ভালোবাসতে চাইছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে আমার ভালোবাসার কথাই আজ বলতে এসেছি।’
‘চুপ করুন! প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ..!’
জলি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ও দৌড়ে চলে গেল ঘরের ভেতর। পুলকের ইচ্ছে হলো ও জলির ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু এটা ঠিক হবে কিনা, এই ভাবনায় ও আটকে গেল। ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে। চুপচাপ। জলি ফিরে এলো না। ও নিশ্চয়ই বিছানায়

মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। পুলক ভীষণ অস্বস্থিতে পড়ে গেল। কী করবে বা ওর এখন কী করা উচিত, তা বুঝতে পারছে না ও। মুহুর্তগুলো ভীষণ ভারি লাগছে ওর। পুলক কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জোর গলায় জলির উদ্দেশ্যে বললো,

'জলি, আপনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন বলে জানতে পেরেছি। এটাকে আমি আমার প্রতি আপনার করুনা হিসাবে দেখিনি। আমার ভালোবাসাকেও আপনি করুনা বলে ভুল বুঝবেন না, প্লিজ! আমি কাল আবার আসবো। প্রয়োজনে প্রতিদিন আসবো। আমাকে আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। আমি ফিরে যাবোও না। আমি বিশ্বাস করি, আজ, কাল বা যে কোন একদিন, আপনি আমার ভালোবাসার মর্যাদা দেবেন। আমি চলে যাচ্ছি।'

পুলক আর দাঁড়ালো না। ও হনহন করে জলিদের উঠোন থেকে বের হয়ে এলো। ওর ভেতরে গুমোট কান্নার মেঘ জমতে লাগলো। ওর মন খারাপ হয়ে গেল। এ ধরনের মন খারাপ পুলকের কখনো হয়নি।

১৫

আজকের দিনটিকে পুলক মনে মনে 'বিশেষ দিন' হিসাবে ঘোষণা করলো। আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেমন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ দিন ঘোষণা করা হয়, আজকের দিনটিকেও পুলক তেমন একটি 'বিশেষ দিন' বলে ঠিক করে নিল। আজকের দিনটিকে পুলক নাম দিল 'বিয়ে দিবস'। পুলক সকালে ঘুম থেকে উঠেই হঠাৎ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ও আজ জলিকে বিয়ে করবে। সিদ্ধান্তটা একাই ও নিয়েছে। নিজের বিয়েটাকে গুরুত্বপূর্ণ করতে ও আজকের দিনটিকে 'বিয়ে দিবস' বলেও ঠিক করে নিল। আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক রকম দিবস পালিত হলেও 'বিয়ে দিবস' পালিত হয়নি এখনো। ও নিজে বিয়ে করে 'বিয়ে দিবস' এর সূচনা করার কথা ভাবতে লাগলো। সকাল থেকে এ সব কথাই ভাবছিল ও। এ কথা ভেবে নিজে নিজেই ও হাসছিলো। ঠান্ডু পুলকের মেসে এলো সকাল ন'টায়। পুলক তখনো থেমে থেমে হাসছিল। ওর হাসি দেখে ঠান্ডু কৌতুহলী গলায় বললো,

'বস, আইজ মনে হইতাছে ভীষণ কোনো ভালো খবর আছে? আপনার মেজাজা কেমন ফুরফুরা!'

পুলক ঠান্ডুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। ঠান্ডুও হাসলো। পুলক ঠান্ডুর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরলো। ও গাইলো, 'তুমি মোর পাও নাই, পাও নাই পরিচয়। তুমি যারে চিনো, সে তো কেহ নয়। পাও নাই, পাও নাই পরিচয়..।' পুলকের কণ্ঠ খারাপ নয়। অনেকদিন হলো ও রেওয়াজ করে না। তারপরও ওর কণ্ঠে সুরের লালিত্ব ফুটে উঠেছে। ঠান্ডু মনযোগ দিয়ে ওর গান শুনছিল। গানটির স্থায়ীটুকু দু'বার গেয়ে থেমে গেল পুলক। পুলকের গান শুনলেই ঠান্ডুর ঢোলক হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠে মনে। ও মুগ্ধ গলায় বললো,

'বস্, আপনে মাস্তানী ছাইড়া গানটাই ধরেন। আমি ঢোল বাজানোটা শিখা নিবো। আপনের গানের গলাটা জবর মিঠা!'

ঠান্ডুর এ ধরনের কথা পুলক আগেও শুনেছে। এর জবাব ও কখনো দেয়নি। আজ জবাবে ও বললো,

'ঠান্ডু আজ থেকে আর মাস্তানী নয়। আমি আজ থেকে সৎ ও সুস্থভাবে জীবন-যাপন শুরু করবো। তুইও ও সব ছেড়ে আমার মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আয়।'

পুলকের কথায় ভীষণ অবাক হয়ে যায় ঠান্ডু। ও কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থাকে পুলকের মুখের দিকে। পুলক ফের বললো,

'কি বললাম, শুনেছিস?'

'জ্বি, শুনলাম। আপনি কি বলছেন!'

'যা বলেছি, তা খুব ভেবেচিন্তেই বলেছি। আমি আজ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছি। কোনো মাস্তানী নয়। কারো নির্দেশে কোনো অপরাধ আর করবো না। আমার মাথার উপর কোনো 'বস' থাকবে না। মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে আমি আজ থেকে পথ চলবো।'

'বস, এসব কি বলছেন!'

'আজ থেকে আর আমাকে 'বস' ডাকবি না। আমরা কেউ কারো বস নই। শিষ্যও নই। আমরা মুক্ত।'

পুলকের কণ্ঠ কেমন আবিষ্ট হয়ে আসে। ঠান্ডুর বিস্ময় সহে এসেছে। ও বলে,

'মাস্তানী ছাইড়া দিলে খারাপ কিছু না। কিন্তু এ সব ছাইড়া এখন কি করবেন?'

'সেটা বলছি। তার আগে বল, তুই কি আমার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবি?'

'আসবো, বস। কিন্তু পেট চলবে কি করে?'

'ভয় নেই। একটা কিছু নিশ্চয় করবো। আমরা কাজ করে খাবো।'

'কাজ! কি কাজ করবো?'

'যে কোনো কাজ করবো। ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করতে পারি। তুইও থাকবি আমার সঙ্গে।'

'রহমত কি জানে এ সব কথা?'

'ওকেও একটু আগে এ কথা বলেছি। ও রাজী হয়েছে।'

'ও কোথায়?'

'ওকে পাঠিয়েছি মসজিদে, হুজুরের কাছে তওবা করতে।'

'তাই নাকি! ভীষণ আশ্চর্যের কথা!'

'হ্যাঁ। তোকেও যেতে হবে। তওবা করে নতুন জীবন শুরু করতে হবে।'

'জ্বি, আচ্ছা, বস।'

'না, আজ থেকে আমাকে 'বস' বলে ডাকবি না। ভাই বলবি। পুলক ভাই।'

'ঠিক আছে, পুলক ভাই।'

ঠান্ডু মাথা নাড়ে। ও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। ও মনে মনে তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে নিল। কোনো ভালো বিষয় ওর সামনে এসে দেখা দিলে ও

'আলহামদুলিল্লাহ' সূরাটি পাঠ করে। আজ ও সূরাটি পুরো মনে করতে পারছিল না। তাই তিনবার 'আলহাদুলিল্লাহ' পাঠ করলো। পুলক আবেশিত গলায় বললো,
'শোন, আরেকটি কথা। আমি আজ জলিকে বিয়ে করবো।'
'বলেন কি! ভীষণ আশ্চর্যের কথা!'
'হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ে হবে। আমি মসজিদের হুজুরকে বলে রেখেছি। তুই শুধু একজন কাজী ডেকে আনবি। পারবি না?'
'বলেন কি, পারুম না ক্যান! শালা, কাজীর কান ধইরা টাইনা লইয়া আমু না?'
'উঁ-হুঁ। কোনো রকম মাস্তানী চলবে না। আজ থেকে আমরা ভদ্রলোকের মতো চলবো। মনে থাকে যেন! তবে হ্যাঁ, জলি যদি বিয়ে রাজী না হয়, তবে..!'
'তবে কি করবেন?'
'ওকে জোর করে ধরে নিয়ে আসবো, কি বলিস?'
'তা খারাপ না। তবে আমার মনে হয়, জলি ম্যাডাম না করবেন না। উনি আপনাকে পছন্দ করেন।'
'তাই নাকি! তুই কি করে বুঝলি?'
'কী কইরা বুঝলাম, তা বলতে পারুম না। তবে আমার তাই মনে হয়।'
'যাক, তাহলে তোর কথায় একটু ভরসা পেলাম। তুই যা। হুজুরের কাছে গিয়ে তওবা করে আস। এরপর যাবি কাজীর কাছে। বলবি, আজ সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে দিতে হবে।'
'ঠিক আছে, যাচ্ছি। আপনি কী করবেন? বিয়ের দিন ঘরে বসে থাকবেন?'
'নারে, না। আমি এখন বের হবো একটা বাসা খুঁজতে। বিয়ে করে বউকে তুলবো কোথায়? এরপর যাবো বিয়ের জন্য কিছু কেনা-কাটা করতে। কেনা-কাটার পর যাবো জলিদের বাড়িতে। ওকে জানিয়ে আসবো বিয়ের জন্য তৈরি থাকতে।'
'সব সুন্দর কইরা সাজাইয়া লইছেন। আজকের দিনটা আপনার ভালোই দেখতাছি!'
এ কথায় মুচকি হাসলো পুলক। ও বললো,
'আর একটা কথা শুনে রাখ। আমি আজকের দিনটার একটা নাম দিয়েছি। দিনটির নাম হচ্ছে 'বিয়ে দিবস'। বুঝলি? হা-হা-হা।'
ঠান্ডুও পুলকের হাসির সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। ও হাসি মুখে বেরিয়ে এলো পুলকের মেস থেকে। মেস থেকে বের হতেই 'আলহামদুলিল্লাহ' সূরাটি ওর মনে পড়ে গেল। ও মনে মনে সূরাটি পাঠ করতে লাগলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এলেও রহমত ফিরে এলো না। মসজিদে গিয়ে হুজুরের কাছে তওবা করে ওর ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু ও ফিরেনি। এ নিয়ে পুলকের মন খারাপ হলো না। ঠান্ডু ফিরেছে। ঠান্ডু পুলকের কথা রাখবে, ও তা বিশ্বাস করতো। পুলক ঠান্ডুকে নিয়ে একটা রিকসায় চড়ে রওনা হলো জলিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ঘর ভাড়া এবং বিয়ের

কেনা-কাটা হয়ে গেছে। এখন শুধু বিয়ের আয়োজনটাই বাকি। পুলকের মনে অদ্ভূত সাহস কাজ করছে। সাহসটা ওর জীবনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ওর সাহস মাঝেমাঝে দুঃসাহসের সীমানা পেরিয়ে যায়। জলিকে বিয়ে করার একা সিদ্ধান্ত নেয়াটা যেমনি ওর সাহস, তেমনি জলির মতামত না নিয়ে বিয়ের আয়োজন করাটাও দুঃসাহসিকতা। পুলকের অন্ধ বিশ্বাস জলি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। জলি যে ওকে পছন্দ করে, এটা ও বুঝতে পারছে। ভালোলাগাটাই তো ভালোবাসার পথে ঠেলে দেয়। তাহলে জলি কেন ওকে ভালোবাসবে না? সুস্থ জীবনে ফিরে গিয়ে হাত বাড়ালে জলি কি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? নিজের ভেতরে যুক্তি এবং প্রশ্ন তৈরি করে ভাবতে থাকে পুলক। ভাবনার ভাবুলতার মধ্য দিয়ে পুলক এক সময় পৌঁছে যায় জলিদের বাড়ি।

'পুলক ভাই, আমরা জলি ম্যাডামের বাড়িতে আইসা পড়ছি।'

ঠান্ডুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় ও। বিকেল এখনো স্বর্ণাভা ছড়িয়ে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষামান। জলিরদের বাড়ির চালে শেষ বিকেলের রোদ লুটিয়ে আছে। বাড়ির উঠোনের আম গাছটির পাতা দুলছে হালকা হাওয়ায়। উঠোনে অদৃশ্য গুমোট নিঃসঙ্গতা। পুলক রিকসা থেকে নেমে গেল। ঠান্ডুর উদ্দেশ্যে বললো,

'তুই রিকসায় বস। আমি জলিকে বিয়ের কথাটি বলে এখুনিই আসছি।'

পুলক ঝড়ো হাওয়ার মতো ঢুকে গেল জলিদের বাড়ির উঠোনে। ঠান্ডুও পুলকের পেছনে ছায়ার মতো এলো। পুলক জলিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে ডাকলো,

'জলি, একটু বাইরে আসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

পুলক জলিকে ইচ্ছে করেই তুমি সম্বোধন করে ডাকলো। তুমি বলার মধ্য দিয়ে ও আজ নিজের অধিকার প্রকাশ করতে চায়। জলিদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন হাসিনা বেগম। তিনি পুলককে দেখে চিনতে পারলেন। হাসিনা বেগম স্থানীয় প্রায় সকল লোকদের চেনেন। তিনি পুলকের উদ্দেশ্যে বললেন,

'বাবা, জলি তো বাড়ি নেই।'

'বাড়ি নেই? ও কোথায় গেছে? কখন আসবে?'

'ও তো আর আসবে না। ও ওর মামার সঙ্গে আইজই চলে গেছে।'

'কী বললেন! কোথায় গেছে?'

'ওর মামার বাড়িতে।'

এ কথায় ভীষণ হতভম্ব হয়ে গেল পুলক। ওর মুখ থেকে আর কোন কথা বেরুলো না। ওর পৃথিবীটা যেন কাঁপছে। ওর মনে হচ্ছিলো, এখুনিই ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ও নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। পেছন থেকে ঠান্ডু এসে পুলককে ধরলো। ওর শরীরটা যেন মাটিয়ে লুটিয়ে পড়া থেকে রক্ষা পেল। ঠান্ডু হাসিনা বেগমের উদ্দেশ্যে বললো,

'হাসিনা খালা, জলি ম্যাডাম কবে ফিরবেন, তা জানেন?'

এর জবাবে হাসিনা বেগম আনন্দিত গলায় বললেন,

'বাবা, ওর বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হইয়া আছে। মামার বাড়িতে যাবার পর পরই ওর বিয়ে হবে। বিয়ে-শাদির পর মাইয়া মানুষ কখন নিজের বাড়িতে আসবো, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? তা ছাড়া, ওর তো বাপ-মা কেউই বাইচা নাই। এইখানে আইসাই বা কি করবো?'
হাসিনা বেগমের কথাগুলো গরম সীসার মতো পুলকের ইন্দ্রীয়তে প্রবেশ করছিল। ঠান্ডু বললো,
'সর্বনাশ! আপনে এই সব কী বলতাছেন!'
হাসিনা বেগম অবাক চোখ কপালে তুলে বললেন,
'এইখানে বাবা, সর্বনাশের কী দেখলেন! এতিম মাইয়াটার একটা গতি হইলো, এইটারে সর্বনাশ কইতাছেন!কত বলাবলির পর মাইয়াটা বিয়াতে রাজী হইছে!'
'খালা, চুপ করেন!'
ঠান্ডুর ধমকে ভড়কে যান হাসিনা বেগম। তিনি বুঝতে পারছেন কেনো জলির খোঁজে পুলক ও ঠান্ডু এসেছে। ওর বিয়ের খবরে ওরা কোনো রেগে যাচ্ছে। তিনি ভয়ার্ত গলায় বললেন,
'বাবারা, আমার কি কোনো ভুল হইছে?'
'না। আপনে ঘরের ভেতরে যান।'
পুলক ঠান্ডা গলায় বললো। ভয়াবহ ভুমিকম্পের পর বিধ্বস্ততার যে ছবি দেখা যায়, পুলকের মনের ছবিটাও এখন সেরকম। ও নিচু গলায় ঠান্ডুকে বললো,
'ঠান্ডু চল, যাই। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'
এ কথা বলে পুলক ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলো। ঠান্ডু ওকে অনুসরণ করলো। ঠান্ডু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুলকের উদ্দেশ্যে হতাশ গলায় বললো,
'বস, 'বিবাহ দিবস'টা আর পালন করা গেল না! আসলে মাইয়া মানুষ হইলো হারামজাদী!'
এ কথার জবাবে পুলক কোনো কিছু বললো না। গভীর বেদনায় ও তলিয়ে যেতে লাগলো।

১৬

পুলক জলির সামনে দাঁড়িয়ে অবাক কণ্ঠে বললো,
'আমাকে না বলে পালিয়ে এসেছো কেনো!'
জলি বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
'পালিয়ে এসেছি মানে?'
'নয়তো কি? আমাকে কিছু না বলে চলে আসাটা পালিয়ে আসা নয়? সে যাকগে, আমার হাতে সময় নেই। তুমি চট করে তৈরি হয়ে নাও। আমাদের এখুনিই যেতে হবে।'
'কোথায়!'
'আমাদের গ্রামে। আমার বাবা খুবই অসুস্থ। তিনি তোমাকে দেখতে চাইছেন। তিনি ছেলের বউ দেখে মরতে চান। তাই তোমাকে নিতে এসেছি।'
এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখলো জলি। স্বপ্নটা দেখলো ও ভোর রাতে। স্বপ্নটা ভীষণ অদ্ভূত। যা কখনো ও ভাবেনি বা কখনো কল্পনা করেনি, তা-ই স্বপ্নে দেখলো ও। স্বপ্নটা শেষ না হতেই

ঘুম ভেঙে গেল ওর। এই স্বপ্ন ওকে ভীষণ কাঁপিয়ে দিল। বুকের ভেতর স্পন্দন বেড়ে গেল। আজ জলির বিয়ে। বিয়ের দিন ভোরে এ ধরনের স্বপ্ন ও কেনো দেখলো, কে জানে! জলি বিছানায় ওঠে বসে বেশ কয়েকবার অসমাপ্ত স্বপ্নটার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলো। দু'হাতের বন্ধনে জড়ানো দু'হাঁটুর উপর চিবুক রেখে ও স্বপ্নটার কথা ভাবছিল। স্বপ্নটার কথা ভাবতে ভাবতে কখোন যে, ওর চোখের কোণ থেকে অশ্রুজলের দু'টি ধারা গাল বেয়ে নেমে এলো, ও বুঝতে পারলো না। যখন বুঝলো, তখন ওর মনে হলো এটা ঠিক ওর কান্না নয়, কান্নার চেয়েও গভীর কিছু। এই অশ্রুজল হয়তো অর্থহীন আবার অনেক অর্থবহ। অথৈ সমুদ্রে গভীর অন্ধকারে বাতিঘরের আলো যেমন পথহারা নৌযানকে পথ দেখায়, এই স্বপ্নটা কি জলিকে কোনো পথ দেখাচ্ছে? এ কথা মনে হতেই জলির বুকের ভেতর দুমরে-মুচড়ে ওঠলো। ও বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'আপা, তুমি কি কাঁদছো?'

শিলার প্রশ্নে হচকিয়ে গেল জলি। শিলা জাগলো কখন? জলি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলো শিলা বিছানায় শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শিলা ওর মামাতো বোন। ও জলির চেয়ে চার বছরের ছোট। শিলা ওর ছোট হলেও দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব। ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ওরা দুজনে প্রতিদিন এক বিছানায় ঘুমায়। প্রতি রাতেই দুজনে অনেক রকম গল্প করে। বিশেষ করে শিলাই গল্প করে বেশি। কিশোরী বয়সটাই স্বপ্নের নানা রঙ দিয়ে ঠাসা। শিলার সব কিছু নিয়ে গল্প করার প্রবণতা, উচ্ছ্বাস আর প্রগভলতা ভালো লাগে জলির। জলিও হয়তো কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হতে পারতো। কিন্তু ওর জীবন রঙ ওঠে যাওয়া বিবর্ণ এক বিপন্ন চিত্রকল্প। ওর ভেতরে উচ্ছ্বাসের নদী মরে শুকিয়ে গেছে। ও যেন হাসতেই ভুলে গেছে। ও কি শিলার মতো যখন তখন খিলখিলিয়ে হেসে উঠতে পারে? জলির ভাবনাকে ভেঙে দেয় শিলার প্রশ্ন।

'বললে না, তুমি কাঁদছো কেন?'

'কই কাঁদছি? তুই কখন জাগলি?'

'তুমি যখন বিছানা থেকে ওঠে বসলে, তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। আপা তুমি কাঁদছিলে, তাইনা ? আমি জানি, বিয়ের দিন মেয়েরা কাঁদে।'

'তুই দেখি, অনেক কিছু জানিস! তা মেয়েরা বিয়ের দিন কোনো কাঁদে, বল দেখি!'

'তা জানি না। কাঁদতে হয় বলেই হয়তো মেয়েরা কাঁদে। আপা, আমি বিয়ের দিন কাঁদবো না।'

'বলিস কি! কোনো?

'বাহ্ রে, কান্নাকাটির কী আছে! ছেলেরা যাদি না কাঁদে, আমরাও কাঁদবো না। শুধু মেয়েরাই কাঁদবে, তা কোনো?'

শিলার চিন্তা-ধারনা এবং কথা একটু ব্যাতিক্রম। ওর ব্যাতিক্রম চিন্তা এবং কথা জলি পছন্দ করে। জলি বললো,

‘শিলা তুই ঘুমিয়ে পড়। সবাই ঘুমাচ্ছেন। কথা বললে মামা-মামীর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।’
‘তুমি ঘুমাবে না?’
‘না, আমার আর ঘুম আসবে না।’
‘তাহলে কি একা একা কাঁদবে?’
‘কাঁদবো কোনো? আর কাঁদলেই বা কি? আমার এই কান্না নিয়ে জগত সংসারের কি এমন ক্ষতি হবে বল?’
জলির মনে হলো এ কথাটি ও ঠিক শিলাকে বললো না, নিজের উদ্দেশ্যেই যেন নিজেকে বললো। ও ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। শিলা নরোম গলায় বললো,
‘একটা প্রশ্ন করবো, আপা?’
‘কর।’
‘সঠিক উত্তর দেবে?’
‘তুই এমনভাবে বলছিস, যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন প্রশ্ন করবি?’
‘অনেকটা সেরকমই। খুবই ব্যক্তিগত প্রশ্ন।’
‘শুনি, কী তোর প্রশ্ন।’
‘আগে কথা দাও, সঠিক উত্তর দেবে।’
‘আচ্ছা দেব।’
জলি হাসলো। শিলা বিছানা থেকে উঠে বসলো। ও জলির মুখোমুখি বসলো। জলির চোখে চোখ রেখে গলা নামিয়ে বললো,
‘তুমি কি কাউকে ভালোবাসো?’
প্রশ্নটি শুনে হতভম্ব হয়ে গেল জলি। এমন প্রশ্নের জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। ও চুপসে গেল। শিলা জলির দু’ হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাগিদ দেয়া গলায় বললো,
‘বলো না, প্লিজ! তুমি কি কাউকে ভালোবাসো?’
‘না।’
ছোট্ট করে জবাব দিল জলি। এই ‘না’ বলতে গিয়ে ওর কণ্ঠস্বর যেন একটু কেঁপে গেল। শিলা বললো,
‘মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যা কথা বলছো।’
‘কেনো মিথ্যা বলবো?’
‘সবাই যে কারণে বলে। ভালোবাসার কথাটা অনেকেই স্বীকার করতে চায় না।’
জলি শিলার কথায় মুখে হাসি টেনে বললো,
‘আমার জীবনটা অন্য সকলের মতো নয়। আমাকে কেউ ভালোবাসবে কিংবা আমি কাউকে ভালোবাসবো-এ ধরনের চিন্তা আমার মধ্যে কাজ করে না। বুঝলি?’
‘তাহলে তোমার খাতায় ‘পুলক’ নামে একজনের নাম কেনো লিখেছো? পুলক কে?’
এ প্রশ্নে ভড়কে গেল জলি। মিহিন একটা কষ্ট ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ওর ভেতরে। শিলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। জলি মুখ নামিয়ে বললো,

‘খাতায় একজনের নাম লিখে রাখার মধ্য দিয়েই কি ভালোবাসা হয়? তুই কি তাই মনে করিস?’
‘তা তো আমি বলতে পারবো না, আপা। তবে এটা যে ভালো লাগার প্রকাশ, তা বলতে পারি।’
‘তুই দেখছি, খুব পেকে গেছিস! এখন ঘুমাতো! আমাকে একটু একা থাকতে দে।’
‘একা বসে বসে কি ঐ লোকটার কথা ভাববে আর কাঁদবে?’
‘কোন লোকটার কথা?’
‘ঐ যে, যার নাম পুলক!’
‘চুপ কর তো! তার কথা ভাবলেই তোর কি?’
‘না, বলছিলাম কি, আজ বিয়ের দিন তার কথা ভেবে আর কী হবে, বল?’
এ কথায় একটু থেমে গম্ভীর গলায় জলি বললো,
‘যদি বিয়ে না করি!’
‘কী বলছো, আপা! তোমার মাথা খারাপ নাকি! বিয়ের দিন সকালে কেউ এমন কথা বলে?’
শিলার বিস্ময় উপভোগ করে জলি হেসে বললো,
‘অনেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসার ঠিক আগ মুহূর্তেও পালিয়ে যায়। যায় না?’
‘তা যায়। তুমিও পালাবে নাকি!’
‘বিয়েটা করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।’
‘বলো কি! এ সব কী বলছো!’
‘হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।’
‘আপা!’
‘শোন্, তুই ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেনো? বিয়ে করা বা না করা আমার জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। এই বিয়েতে মামার উদ্বেগ দেখে রাজী হয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, বিয়ে করাটা আমার ঠিক হবে না।’
‘আপা, তুমি আস্তে বলো!’
জলি শিলার উদ্বেগ গায়ে মাখলো না। ও বললো,
‘শিলা, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাগ গুছিয়ে বের হয়ে পড়বো। তুই চুপ থেকে আমাকে সাহায্য করবি।’
‘সত্যি, সত্যিই তুমি পালাচ্ছো!’
‘তুই অমন করছিস কেনো! আমার জীবন নিয়ে আমারই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাইনা? শোন্, মামা ঘুম থেকে উঠলে, আমার চলে যাওয়ার কথাটা জানাবি। বলবি, বিয়ের আয়োজন বন্ধ করে দিতে। আর হ্যাঁ, তুই কিন্তু সবকিছু সামলাবি। বুঝলি?’
‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার যা ইচ্ছা করো।’
জলি আর কোনো কথা বাড়ালো না। বিয়ে না করার ইচ্ছাটা অনড় পাথর মতো চেপে রইলো ওর মনে। ও দ্রুত ওর ব্যাগ গুছিয়ে নিল। এই সময়টুকু বিস্ময়ভরা চোখে জলির দিকে

তাকিয়ে রইলো শিলা। ভোরের নরোম আলো ধীরে ধীরে তীব্র হচ্ছে। থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে পাখিদের গুঞ্জণ। জলি ব্যাগ গুছিয়ে যখন দরোজা খুললো, তখন ভোরের আলো এসে হামলে পড়লো ওদের ঘরে। জলি খোলা দরোজার সামনে একটু দাঁড়ালো। শিলা দেখলো, ভোরের কাঁচারোদের কোমল আলোয় জলিকে অদ্ভূত লাগছে। ওর মনে হচ্ছিলো, জলি জীবন সংগ্রামের নির্ভীক এক পথযাত্রী। শিলা মনে মনে ওর সাহসী আপাকে শুভেচ্ছা জানালো। জলি যাবার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো,

'শিলা, যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, যাও। শেষ একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'বল।'

'তুমি কি ঐ পুলক লোকটির কাছে যাচ্ছো?'

এ কথায় জলি মুখ টিপে হাসলো। ও বললো,

'যদি নিজেকে শুদ্ধ করতে পারতাম, তবে তার কাছেই যেতাম। কিন্তু আমার সেই ভাগ্য নেই। আমি যাচ্ছি, অজানার উদ্দেশ্যে। ভাগ্যের কাছেই নিজের ভবিষ্যত তুলে দিয়ে বের হচ্ছি। তোরা ভালো থাকিস। মামাকে বলিস, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন।'

জলি আর দাঁড়ালো না। দাঁড়িয়েই বা কী হবে? ও হচ্ছে কালের স্রোতে ভেসে চলা একখন্ড খরকুটো।

১৭

এক বছর কারো কাছে তেমন বেশি দিন নয়, আবার কারো কাছে অনেক দীর্ঘ সময়। এক বছরে অনেকের জীবনে যেমন খুব একটা পরিবর্তন আসে না, তেমনি অনেকের জীবনে আমূল পরিবর্তন চলে আসে। গত এক বছরে জলির জীবনে খুব একটা পরিবর্তন না এলেও ও নিজের জীবনের দায়-ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে পেরেছে। এটাই ওর জীবনের বড় পরিবর্তন। জলির বুকভরা হতাশা আর কষ্ট থাকলেও জীবন যুদ্ধে ও কখনো হেরে যেতে চায়নি। ও এখন চাকরি করছে। একটি গুঁড়ো সাবান উৎপাদনকারী কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধির কাজ জুটিয়ে নিয়েছে ও। ওর কাজ হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঐ কোম্পানীর গুঁড়ো সাবানের পাবলিসিটি করা এবং তা বিক্রি করা। ও শুধু ক্রেতার অর্ডার নেয়। এই অর্ডার মোতাবেক ঐ কোম্পানী গুঁড়ো সাবান পৌঁছে দেয় ক্রেতার কাছে। যৎ সামান্য বেতন এবং সাবান বিক্রয়ের উপর যে কমিশন পায়, তাতে ওর ভালোই দিন কেটে যাচ্ছে। এই চাকরিটি আহামরি তেমন না হলেও অবিভাবকহীন জলির জন্য তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ওর তা-ই মনে হয়। তবে এই চাকরিটায় ঝুঁকিও আছে। অনেক সময় অনেক বাড়িতে গিয়ে ওকে বিব্রত হতে হয়। অনেক সময় পুড়তে হয় পুরুষদের লালসার আগুনে। সাবান বিক্রির কাজ করতে গিয়ে অনেক বাড়িতে পুরুষদের আকারে ইঙ্গিতে আশালীন প্রস্তাবও পেয়েছে। এ সব সহ্য করতে হয়। ওর তেমন ভয় নেই বলেই ও ঝুঁকি নিয়েই চাকরিটা করছে। ও প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন বাড়ির দরোজায় নক করে।

জলি আজ এসেছে টিপু সুলতান রোডে। পুরানো ঢাকায় ও কখনো আসেনি। এবার ওর ডিউটি পড়েছে এই এলাকায়। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে ও তিনটি বাড়িতে গিয়ে কথা বলে দুটি বাড়ি থেকে ও সাবান ক্রয়ের অর্ডার পেল। এতে জলির মনটা খুশি হয়ে গেল। গতকাল হাতির পুল এলাকায় সারাদিনে বত্রিশটি বাড়িতে গিয়ে ও অর্ডার পেয়েছে মাত্র তিনটি বাড়ি থেকে। আজ সকালটাই শুভ। ভাবে ও। খুশি মনে ও ২০১ নম্বর বাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপলো। বাড়িটি একতলা। বড় বড় অট্টালিকায় যারা থাকেন, তারা ভ্রাম্যমান বিক্রেতার কাছ থেকে কোন কিছু কিনতে চান না। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তরা কেনেন। জলি এখন যে বাড়ির কলিং বেল টিপেছে, এখানে ধনী লোক থাকার কথা নয়। বেশ পুরানো দিনের বাড়ি। জলি আরেকবার কলিংবেল টিপলো। ও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলো। বিক্রয় প্রতিনিধিদের মুখে সব সময় হাসি ধরে রাখতে হয়। দরোজাটা খুললো পুলক। পুলককে দেখে জলির মুখে ধরে রাখা হাসিটা মুহুর্তেই মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো অপার বিস্ময়। পুলকের চোখে-মুখেও গভীর বিস্ময় ফুটে উঠলো। দু'জন দু'জনার দিকে বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কারো মুখে কোনো কথা জোগালো না। জলির মাথাটা যেন ঘুরছে। পুলক এক সময় ধাতস্থ হলো। ও বললো,

'আপনি ! আমি নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না!'

জলির ঠোঁট কাঁপলো। ও কিছু বলতে পারলো না। এতোটা বিস্ময় সহ্য করার মতো নয়। পুলক দরোজা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললো,

'ভেতরে আসুন।'

জলি আদেশমানা মেয়ের মতো রুমের ভেতরে ঢুকলো। রুমটি অগোছালো। চারটি চেয়ার ও একটি টেবিল রয়েছে। টেবেলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বই ও ম্যাগাজিন পড়ে আছে। ছোট একটা কাঠের আলমারি ও একটি ওয়ারড্রব পাশাপাশি রয়েছে রুমটির এক কোণে। এটি সম্ভবত ড্রয়ং রুম। ভেতরে একটি রুম রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে। ভেতরের রুমের দরোজায় পর্দা ঝুলছে। পর্দাটাও মলিন। অনেকদিন ধোয়া হয়না। চট করে দেখে নিল জলি। ওর বুক দুরু দুরু কাঁপছে। পুলক জলির সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এলো। নিজে আরেকটি চেয়ারে বসে বললো,

'আপনি এই চেয়ারে বসুন।'

জলি চেয়ারে বসলো। বিস্ময়ের পাশাপাশি বেদনার একটা স্রোত বইছে ওর মনে। ও পুলকের দিকে তাকালো। পুলকের মধ্যে একটা পরিবর্তনের ছাপ দেখতে পেল। পোশাকে -আশাকে স্মার্টনেস ফুঠে উঠেছে। চেহারার মধ্যে রাগী ভাব নেই। দৃষ্টি কোমল। ও পুলকের দিকে তাকিয়ে চট করেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না। পুলক বললো,

'কী দেখছেন, অমন করে। আমি অনেক বদলে গেছি, তাই না?'

'অনেক বদলেছেন!'

জলির কথায় একটু হাসলো পুলক। ও বললো,

‘আপনিও কিন্তু বদলেছেন। কেমন শুকিয়ে গেছেন। নিজের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন না, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি নিজেকে পুড়িয়ে কী পান, বলুন তো?’
একটা ধাক্কা এসে লাগলো জলির ভেতরে। একটা জলপ্রপাত নেমে আসতে চাইছে। এমনভাবে এই প্রশ্ন ওকে কখনো কেউ করেনি। ও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো পুলকের মুখের দিকে। ও এর জবাবে কী বলবে, ভেবে পেল না। পুলকের ভেতরে ভীষণ তোলপাড় চলছে। জলি কেনো এবং কীভাবে ওর কাছে এসেছে, তা ওর জানতে ইচ্ছে করছে। এক বছর পর জলি ওর কাছে কোনো এসেছে, তা ও বুঝতে পারছে না। এক বছর পুলকের কাছে অনেক দীর্ঘ সময়। গত এক বছরে ওর জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। জলি ওর মামার সঙ্গে নীলফামারী চলে যাবার পুলক মুন্সিগঞ্জ ছেড়ে চলে আসে ঢাকায়। ও মাস্তানী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করে দেয়। এক বছরের মধ্যে ব্যবসায় ও যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। ও প্রথমে শ্যামবাজারে আড়তগুলোতে আলু-পটলসহ বিভিন্ন তরকারী সরবরাহ করার ব্যবসায় নামে। ঢাকার কাঁচা বাজারে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরের শাক-সব্জি ও তরকারীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পুলক তরকারির ব্যবসা প্রথমে ছোটভাবে শুরু করেছিল। এখন এই ব্যবসা জমে ওঠেছে। বেড়েছে ব্যবসার পরিধি। ব্যবসার কারণে পুলকের ব্যস্ততা দিনদিন বাড়ছে। ব্যবসা শুরুর ছয় মাসের মধ্যে ও টিপু সুলতান রোডে এই বাসাটি ভাড়া নেয়। এই বাসাতেই থাকছে ও। একা। মাঝেমাঝে গ্রামের বাড়িতে যায় ও। মুন্সিগঞ্জ শহরে পুলক খুব একটা যায় না। ফেলা আসা দিনের স্মৃতি ওকে পীড়া দেয়। এই শহর জলির কথা মনে করিয়ে দেয়। কষ্ট দেয়। জলির কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ জলি নিজে ওর বাসায় এসে হাজির। জলি কি কোনো সমস্যায় পড়ে ওর কাছে এসেছে? প্রশ্নটা মনে হতেই ও বললো,
‘আপনি কি কোনো সমস্যায় পড়েছেন?’
জলি অবাক চোখ তুলে বললো,
‘না!’
‘তাহলে.?’
‘কোনো আপনার কাছে কি আমি আসতে পারি না? আমার আসাটা কি অন্যায় হয়েছে?’
‘না, ঠিক তা নয়। আচ্ছা, আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?’
এ কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ফেললো জলি। ওর হাসির সামনে বিব্রত হয়ে পড়লো পুলক। এরপর কী বলা যায়, তা ও ভাবতে লাগলো। হাসি থামিয়ে জলি বললো,
‘আমার স্বামী নিয়ে আপনার এতো কৌতুহল কোনে? আপনি বিয়ে করেননি?’
এই প্রশ্নে হেসে ফেললো পুলকও। ও বললো,
‘বিয়ে নিয়ে আর ভাবিনি। আর সত্যিকথা বলতে কি, আপনার স্বামীর কথা জানতে আমার ইচ্ছে করছে।’
‘জেনে কী হবে?’
‘কী আর হবে। আপনি ভালো আছেন জানলে ভালো লাগবে।’

‘সত্যি বলছেন! নাকি ভালো নেই জানলে, এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পাবেন?’

‘আত্মতৃপ্তি পাবো কেনো? আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারার আপনার যেমন অহংকার আছে, আমারও না পাওয়ার কষ্ট মেনে নেবার মানসিকতা আছে। এই মানসিকতা আপনার অহংকারের চেয়ে কম মর্যাদার নয়।’

এ কথায় মিষ্টি করে হাসলো জলি। ও বললো,

‘আপনার দ্বিধাহীন কথা এবং মানসিকতা আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। আজ আপনার এই রূপটি দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছে।’

‘ধন্যবাদ। তবে আমি আপনাকে মুগ্ধ করতে চাই না।’

‘কিন্তু আমি যে, সেই অনেক আগে থেকেই মুগ্ধ হয়ে আছি!’

বলেই জলি ফের হাসলো। এ কথায় একটু লজ্জা পেল পুলক। ও বললো,

‘তাহলে আর পালিয়ে চলে গিয়ে বিয়ে করতেন না।’

‘আপনাকে কে বললো যে, আমি বিয়ে করেছি!’

‘মামার বাড়িতে গিয়ে আপনি বিয়ে করেননি!’

অবাককণ্ঠে জানতে চাইলো পুলক। জলি হাসলো। ও নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। ভেতরে ভাঙন হচ্ছে। ও বললো,

‘আমি কাউকে বিয়ে করিনি। তবে বিয়ে করার কথা ছিল।’

‘তাই নাকি! বিয়ে কোনো করেননি?’

‘এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে কোনো দেবো? এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

পুলক জলির মুখের দিকে হা করে চেয়ে রইলো। ও কি বলবে, ভেবে পাচ্ছেন না। ওর ভেতরে মিহিন কষ্টটা যেন মিইয়ে যাচ্ছে। আনন্দের একটা রিদম টের পাচ্ছে ও। জলি বললো,

‘আমি কিন্তু আজ আপনার কাছে আসিনি। আমি জানতাম না, আপনি এই বাসায় থাকেন।’

‘তাহলে..! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘আমি একটা চাকরি করি। চাকরিটা হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে নক্ করা। গৃহিণীদের কাছে গিয়ে একটি গুঁড়ো সাবান কোম্পানীর প্রোডাক্টস দেখানো। আমার কথা শুনে কেউ কেউ গুঁড়ো সাবান কেনেন। এটাই আমার কাজ।’

‘আচ্ছা!’

‘হ্যাঁ, আপনার বাসার কলিং বেল টিপেছিলাম গুঁড়ো সাবান বিক্রির জন্য। এখন দেখুন, ব্যবসার কথা ফেলে কেমন নিজেদের আলেচনা নিয়ে জমে গেছি।’

এ কথা বলে হাসলো জলি। পুলকও হাসলো। পুরো ঘটনাটাই ওর কাছে কেমন ‘নাটক’ ‘নাটক’ মনে হচ্ছে। ওর বিহ্বলতা কাটতে চায় না। জলির উঠা উচিত। কিন্তু ও উঠতে পারছে না। পুলকের সামনে বসে থাকতে ওর ভালো লাগছে। নিজেকে নিয়ে নিজের ভেতরে ও শিউরে উঠে। পুলক ওর সামনে এই মুহূর্তে চুপচাপ। জলি পরিবেশ হালকা করার জন্য কথা বললো।

‘আচ্ছা, আপনার সাগরেদ ঠান্ডু কী করেন? সেকি এখনো আপনার সাগরেদ আছেন?’
‘হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই আছে। আমার ব্যবসায় ওকে রেখেছি।’
এ কথা বলেই পুলক প্রশ্ন করলো,
‘আচ্ছা, আপনি কোথায় থাকেন, কার সঙ্গে থাকেন?’
জলি বললো,
‘কার সঙ্গে আবার থাকবো! আমি থাকি মেয়েদের একটি হোস্টেলে। ঢাকা শহরে অভিবাবকহীন একটি মেয়েকে আশ্রয় কে দেবে?’
পুলক জলির জবাব শুনে যেন স্বস্থি পেল। জলি এবার প্রশ্ন করলো,
‘আপনার বাবা-মা কেমন আছেন? আর শিলা?’
একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুলক বললো,
‘বাবা খুবই অসুস্থ। আমি আজ বাড়ি যাচ্ছি। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন? বাবা মৃত্যুর আগে তার পত্রবধূকে দেখতে চান।’
এ কথায় হতভম্ব হয়ে গেল জলি। এক বছর আগে দেখা স্বপ্নটার প্রতিফলন আজ হলো কেনো? নিজের ভেতরের চেপে রাখা কান্নাটা ও আর ধরে রাখতে পারলো না। ওর দু’চোখ জলে ভিজে গেল। পুলক অবাক হলো না জলির এই কান্নায়। ও বললো,
‘তোমাকে কাঁদলেও ভালো দেখায় !’
জলিকে ও ইচ্ছে করেই ‘তুমি’ করে বললো। ওর মনে হলো এখন আর ওকে ‘আপনি’ বলাটা অবান্তর। পুলক সাহস করে দু’হাত বাড়িয়ে জলির দু’হাত ধরলো। জলি বাধা দিল না। জলির শরীরটা কেঁপে উঠলো শুধু। ওর দু’চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে। এই অশ্রুজল আনন্দ, না বেদনার, তা ও বুঝতে পারছে না। পুলকের বুকে লুটিয়ে পড়তে ওর ভীষণ হচ্ছে করছে ।

১০ নভেম্বর,০৫
নিউইয়র্ক।